প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, 2011

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞান **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম ঃ

PG Pol. Sc. : 05 : 1, 2 & 4

রচনা

পর্যায় 1

পর্যায় 2

পর্যায় 4

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) বিকাশ ঘোষ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Pol. Sc. –V

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়

1

1	3-21
2	22-48
3	49-75

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

পর্যায়

2

1	78-85
2	86-93
3	94-100

পর্যায়

4

1	103-110
2	111-118
3	119-127
4	128-136

7(D-2)

পর্যায় 1

সংস্কৃতির বিবর্তন ঃ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোকে 57
লোকসংস্কৃতি ঃ গণসংস্কৃতি ঃ জনসংস্কৃতি ঃ পপ্‌লোর 66
লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ 69
গণসংস্কৃতি ঃ জনসংস্কৃতি ঃ পপ্‌লোর 71
সাংস্কৃতি বিবর্তনের ধারায় সংস্কার ও অলৌকিকত্ব 85
উপসংহার 103
অনুশীলনী 104

পর্যায় 2

সমাজ ও সংস্কৃতি 106
চারু ও কারু শিল্প 116
অনুশীলনী 127

পর্যায় 3

নামতত্ত্ব ঃ স্থাননাম-ব্যাক্তিনাম-সংস্কারকেন্দ্রিকনাম 130
পাঠ ও পর্যালোচনা ঃ লোককাহিনি - ছড়া - প্রবাদ 131
অনুশীলনী 138
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি 138

পর্যায় ঃ প্রথম

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ১ তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ তুলনামূলক রাজনীতির উপর প্রারম্ভিক প্রভাব

১.৩ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুলনামূলক রাজনীতি

১.৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ঘটনাবলী

১.৫ ভারতের তুলনামূলক রাজনীতি

১.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ভূমিকা

তুলনামূলক রাজনীতি হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অন্যতম প্রাচীন ও দুরূহ উপশাখা (subdiscipline)। সেই অ্যারিস্টোটলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, তত্ত্ব ও সামান্যীকরণের (generalisation) জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা ও ধারণার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বারবার তুলনামূলক রাজনীতির সাহায্য নিয়েছে। আমাদের নিজস্ব সময় ও আচরণবিধি সংক্রান্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব ও প্রবন্ধের নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও যাচাই করার এক পরীক্ষাগারের থেকে একটুও কম নয়। একথা সত্যি যে, অবসাদের মুহূর্তে আমাদের মনে হয় যে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা এ মেটাতে পারেনি। কিন্তু এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মর্যাদাবৃদ্ধির পিছনে তুলনামূলক রাজনীতির এক বিশাল অবদান রয়েছে।

ক্লাসের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো তুলনামূলক রাজনীতিরও এক ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এর বর্তমান সংকট উপলব্ধি করতে ও এর ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে আমাদের অতীতের দিকে নজর ফেরাতে হবে।

আমরা যদিও মেনে নিই যে তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার সূচনা হয় অ্যারিস্টোটলের যুগে, আধুনিক পদ্ধতিতে এই বিষয়টি অধ্যয়নের শুরু কিন্তু ম্যাকিয়াভেলির সময়ে। এর আধুনিক বিকাশকে এই পর্যায়গুলিতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ;

(২) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ;

(৩) ১৯৪৫ সাল থেকে বর্তমান সময়।

এই পর্যায়গুলিকে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে মনে করার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ প্রতিটি পর্যায়ের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমাপতন-ও (Overlap) লক্ষ্য করা যায়।

১.২ তুলনামূলক রাজনীতির উপর প্রারম্ভিক প্রভাব

রাজনীতির তুলনামূলক অধ্যয়নের সুবিধাগুলি সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মনীষীরা অবহিত ছিলেন। এটি এক সুপরিচিত তথ্য যে, অ্যারিস্টোটল একশো আটান্নটি রাষ্ট্রের সংবিধানের উপর এক তুলনামূলক অধ্যয়ন চালিয়েছিলেন। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে তাঁর মূল ধারণা ও ওই ব্যবস্থাগুলির প্রকৃতি নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি গড়ে তুলেছিলেন। দুটি পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর ভিত্তি করে অ্যারিস্টোটল রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন, তা যেমন স্পষ্ট তেমনই যথাযথ এবং আজকের দিনের জন্যও তা আদর্শস্থানীয়।

সারণি ১.১

অ্যারিস্টোটল-কৃত রাজনৈতিক/শাসনসরকারের শ্রেণিবিভাগ

		শাসকের সংখ্যা		
		এক	অল্প	অনেক
শাসনের গুণমান	বিশুদ্ধ	রাজস্ব	অভিজাততন্ত্র	সমাজ
	বিকৃত	স্বৈরাচার	ক্ষুদ্র গোষ্ঠীশাসন	গণতন্ত্র

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

অ্যারিস্টোটল অবহিত ছিলেন যে বাস্তবে উপরের কোন ধরনটিই 'বিশুদ্ধ' রূপে পাওয়া যায় না। কাজেই এগুলিকে আমরা 'আদর্শ' ধরন আখ্যা দিতে পারি, যেগুলি এ সত্ত্বেও প্রকৃত সরকারি ব্যবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয়। কারও কারও মতে আমরাও অ্যারিস্টোটলের শ্রেণিবিভাজন প্রণালীর মধ্যেও এক শক্তিশালী অবরোহী (deductive) উপাদান খুঁজে পেতে পারি। এর অর্থ, নীতি থেকে নমুনা বা দৃষ্টান্তে পৌঁছে যাওয়া। তুলনামূলক রাজনীতির কোনও আধুনিক ছাত্র অবশ্য এর উল্টো দিকে যেতেই পছন্দ করবে। অর্থাৎ আরোহ প্রণালী (inductive method) অবলম্বন করে সে প্রথা থেকে নীতির দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু এর ফলে অ্যারিস্টোটলের শ্রেণিবিভাজন বা তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির গুরুত্ব হ্রাস পায় না।

প্রাচীনদের মধ্যে এর পরবর্তী মনীষীরা দু'জনেই রোমান—পলিবিয়াস ও সিসেরো। তাঁরা অ্যারিস্টোটলের ধারণাগুলিকে রোমান চিন্তাধারায় সঞ্চারিত করেন এবং অন্ততঃ আংশিকভাবে তুলনাধর্মী অধ্যয়নে নিজেদের নিমগ্ন করেন। অ্যারিস্টোটলীয় শ্রেণিগুলিকে তাঁরা আনুষ্ঠানিক ও আইনী ভাষায় প্রয়োগের চে া করেন। রাজতন্ত্রী, অভিজাততন্ত্রী ও গণতন্ত্রী উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এক মিশ্র সরকারের উপযোগিতার উপর পলিবিয়াস গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে এই মিশ্র ধরনগুলি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে উঠবে। এদিকে সিসেরো আবার স্বাভাবিক নিয়মকানুন ও ন্যায়বিচারের ধারণাকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যা রোমান চিন্তাধারার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতির প্রাচীনতম উৎস হিসাবে হ্যারী একস্টেইন নবজাগরণ বা এমনই রেনেসাঁসের রাজনৈতিক চিন্তাকে, বিশেষত নিক্কোলো ম্যাকিয়াভেলির রচনাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। সেটি ছিল এমনই এক সময়, যখন রাষ্ট্রকে এক 'শিল্প কর্ম' ('Work of art') বলে মনে করা হত। রাষ্ট্রের শাসনকার্য প্রণালী সম্পর্কে মনোযোগ ও কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময়ে ম্যাকিয়াভেলি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, অর্থাৎ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসনের কলাকৌশল ও বিচক্ষণতার সূত্রগুলি গড়ে তোলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সময়ের ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য অংশগুলির রাজনীতি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন এবং শাসকদের সাফল্য ও রাষ্ট্রগুলির শক্তির উৎসগুলি বোঝার চেষ্টা করেন। 'দি প্রিন্স' ও 'ডিসকোর্সেস'—এই দু'টি গ্রন্থেই তাঁর লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক আচরণের সামান্যীকরণ।

জ্ঞানদীপ্তি-র (Enlightenment) সময়ে মন্তেস্ক্যুর 'দি স্পিরিট অফ্ দি লজ' রচনায় তুলনামূলক রাজনীতির প্রতি আগ্রহ একেবারে তুঙ্গে ওঠে। ম্যাকিয়াভেলির মত রাষ্ট্রশাসন বা শাসকের আচরণ মন্তেস্ক্যুর আলোচনার বিষয় ছিল না। তাঁর চর্চার বিষয় ছিল গঠনতন্ত্র, অর্থাৎ সরকার কীভাবে গঠিত হয়ে থাকে। তাঁর 'সামগ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গি এ কথা ধরে নিয়েছিল যে সমাজের বিভিন্ন অংশ এক ঘনিষ্ঠ আন্তঃ নির্ভরতার সম্পর্কে আবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি এইভাবে সরকারগুলির শ্রেণিবিভাজন করেন।

সারণি ১.২

মন্তস্ক্যু-কৃত সরকারের শ্রেণিবিভাজন

		অঞ্চলের আয়তন		
		ছোট	মাঝারি	বড়
শাসকের সংখ্যা	অনেক	প্রজাতন্ত্রী গণতন্ত্রী		
	অল্প	অভিজাততন্ত্রী		
	এক		রাজতন্ত্রী	স্বৈরাচারী

সরকারের প্রকৃতি ও কাজকর্ম-এই দুটি বিষয়কেই মন্তেস্ক্যু গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এইখানে যে তিনি অর্থনীতি, সমাজ বাস্তুসংস্থান ইত্যাদির পারস্পরিক সংযুক্তিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তির সূত্রগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তত্ত্ব ও সামান্যীকরণের বিকাশের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মন্তেস্ক্যুর সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার যে ধারা প্রচলিত ছিল তাকে সরিয়ে শীঘ্রই জায়গা করে নেয় ঐতিহাসিক নিয়মানুগতার (historicism) তত্ত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ

শতাব্দীতে জার্মান মনীষীদের তত্ত্বগত বিতর্কের মধ্য দিয়ে এই ধারা জন্ম নেয়। এই ধারার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হেগেল ও মার্কস-এর মতো বিখ্যাত নাম। বিমূর্ত চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে তাদের তত্ত্ব নির্মাণ এবং 'বিষয়বস্তু'-র (content) দিকে তাঁদের অমনোযোগ তুলনামূলক রাজনীতিকে তেমন সাহায্য করতে পারেনি। কিন্তু তাঁদের অবদানের প্রকৃত মূল্য হল তাঁদের গড়ে তোলা ভাবনাগুলি, যেমন শ্রেণির ভাবনা। রাজনীতি ও অর্থনৈতিক প্রগতি, রাজনীতি ও শিক্ষা বা রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কের যে সমস্যা, তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে সেই দিকেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলির উপর তাঁদের দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি সমাজ ও সভ্যতা সংক্রান্ত তুলনার এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

কিছুদিনের জন্য অন্তত এই ঐতিহাসিক নিয়মানুগতার তত্ত্ব শীঘ্রই প্রত্যক্ষবাদী বা দৃষ্টবাদীদের (positivist) দ্বারা মর্যাদাচ্যুত হয়। প্রত্যক্ষবাদ দুটি প্রবণতার ইঙ্গিত দেয় ঃ প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা, যা সময় সূত্র বা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয় এবং এই স্থানগুলিই হল পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান-এর (Empirical Science) ভিত্তি ; দ্বিতীয়ত, বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে সামান্যীকরণ তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাথমিক উপাদানগুলির সাহায্যে তাকে নির্মাণ বা পরীক্ষা করা হয় এবং এই পন্থায় যে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় তা নৈর্ব্যক্তিক।

প্রত্যক্ষবাদীরা নিয়মানুগতা তত্ত্বের যে পর্যালোচনা করেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের পক্ষে এখন এটুকু জানাই যথেষ্ট যে প্রত্যক্ষবাদ রাজনীতি অধ্যয়নের তিনটি দিককে উৎসাহিত করে : প্রত্যক্ষবাদ রাজনীতি গবেষণাকে গুরুত্ব দেয়—প্রথমে বিমূর্ত তত্ত্বের দিকে, এর পরে বিধিসম্মত আইন অধ্যয়নের দিকে (যেখানে প্রায়শই কল্পিত তথ্য বা ভাসা-ভাসা অগভীর তথ্যের উপর ভীষণ মনোযোগ দেওয়া হয়) এবং শেষে রূপরেখা বা আকৃতিগত অধ্যয়নের (Configurative studies) দিকে, অর্থাৎ বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সংগঠনগুলিকে অনন্য বা একক (Unique) সত্তা হিসাবে দেখতে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এই প্রবণতাগুলি তুলনামূলক রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে যাই।

১.৩ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তুলনামূলক রাজনীতি

এই পর্যায়ে দার্শনিক স্তরে প্রত্যক্ষবাদ ও রাজনৈতিক স্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৃষ্টি। মার্কিন ও ফরাসি বিপ্লব এবং আগের শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সমগ্র সামাজিক জীবনে এক গতির সঞ্চার করেছিল। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে পড়ছিল, তাদের জায়গায় গড়ে উঠছিল নতুন নতুন জাতি-রাষ্ট্র। এই প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের তালিকাভুক্তি, শ্রেণিবিভাগ, তুলনা ও বিশ্লেষণ যথাযথ মনে করেছিলেন। যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক

কারিগরিতে (Social engineering) বিশ্বাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেয় সংবিধান ও বিধিসম্মত আইনি কাঠামো সম্পর্কে আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে। এটা বলা হয়ে থাকে যে ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল সংবিধান সৃষ্টির এক উত্তম সময়। একটি যথার্থ সরকারের প্রয়োজন একটি যথার্থ সংবিধান—এটাই ছিল প্রচলিত ধারণা।

নাগরিকত্ব ও সরকারি প্রশাসনের জন্য প্রশিক্ষণের ধারণাটিরও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হয়েছিল জার্মানিতে, যেখানে নতুন একত্রিত রাষ্ট্র তার নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের পরিচিতি করিয়ে দেওয়াকে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য মনে করেছিল। একথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে বিশেষ অ িবাসীদের তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি ছিল।

বিধিসম্মত বা আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামোর ভাবনা তুলনামূলক রাজনীতি সম্পর্কিত চর্চাকে আকৃতিগত বিশ্লেষণের দিকে চালিত করে, অর্থাৎ কোনও বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একক ও অনন্য মনে করে তার বিশ্লেষে র উপর গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। এই প্রবণতাগুলি সবথেকে ভালভাবে প্রকাশ পায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের তিনটি রচনার মধ্যে। এগুলি হল, উইলহেলম রশার-র 'Politik' (১৮৪৭ এবং ১৮৯২ সালের মধ্যে রচিত), থিওডর উলসে-এর 'Political Science or The state Theoretically and Practically Considered' (১৮৭৮) ও উডরো উইলসন-এর 'The state : Elements of Historical and Practical Politics : A Sketch of Institutional History and Administration' (১৮৯৫)।

রশার-এর সর্বসম্বলিত গ্রন্থটি যেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম (Brahminigni) থেকে নেপোলিয়ন—সব কিছুই স্পর্শ করেছিল, উলসে-এর চর্চার মূল বিষয় ছিল স্বাভাবিক আবিষ্কার ও রাষ্ট্রের তত্ত্ব। অন্য দিকে উইলসন-এর আলোচনার বিষয় ছিল গ্রীস ও রোম থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং পরে মুখ্যযুগের 'টিউটোনিক শাসনব্যবস্থা' ('Teutonic Polity'), জার্মান ও ফরাসি সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্র, এবং ফরাসি, জার্মান, সুইশ, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান, সুইডিশ-নরওয়েজিয়ান, ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের বিধিসম্মত আইনি কাঠামোগুলি সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা।

ঐতিহাসিক নিয়মানুগতা তত্ত্বের একটি প্রতিক্রিয়া যদি আনুষ্ঠানিক আইন-সর্বস্বতা হয়, তাহলে আর একটি হল রাজনৈতিক বিবর্তনবাদের (Political evolutionism) দিকে অগ্রসর হওয়া। এক দিক থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক বিবর্তনবাদীরাই বলতে গেলে সেই সময়ে তুলনামূলক রাজনীতিকে জীবিত রেখেছিলেন, যখন আনুষ্ঠানিকতা ও আইন-সর্বস্বতার প্রভাবে আকৃতিগত বিশ্লেষণই প্রচলিত ধারা হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক বিবর্তনবাদ যেমন ঐতিহাসিক নিয়মানুগতা তত্ত্বের এক প্রতিক্রিয়া, তেমনই তা এই তত্ত্বের এক ধারাবাহিকতাও বটে। রাজনৈতিক বিবর্তনবাদ যখন চূড়ান্ত অবস্থা হিসাবে কোনও লক্ষ্য ধরে নেয় (যেমন গণতন্ত্র, অথবা 'যোগ্যতম মানুষই টিকে থাকে'), তখন তা ঐতিহাসিক নিয়মানুগতার প্রায় সমার্থক হয়ে যায়। অন্য দিকে, বিশ্ব ইতিহাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সমস্যাগুলির (যেমন আধুনিক রাষ্ট্রের উৎস) উপর গুরুত্ব দেওয়ায় ও অস্পষ্ট সামান্যতা বা সর্বজনীনতার স্থানে বাস্তব সত্যকে বেশি মান্য করায় ঐতিহাসিক নিয়মানুগতা তত্ত্বের থেকে তার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

রাজনৈতিক বিবর্তনবাদীদের রচনায় দুই ধরনের চিন্তা লক্ষ্য করা যায় প্রথমটি বিকাশের পর্যায় ও দ্বিতীয়টি বিকাশের পর্যায়ক্রমের পিছনে চালিকা শক্তি সংক্রান্ত। এই চিন্তাধারা অবলম্বনে গুরুত্বপূর্ণ হল স্যার হেনরি মেইন-এর 'Ancient Law' (1861), 'Early History of Institutions' (1874), এডওয়ার্ড জেন্‌ক-এর 'Short History of Politics' (1900), 'The State and the Nation' (1919), ওপেনহাইমার এর 'The State' (1914) এবং জি ই স্মিথ ও ডব্লু জে পেরী-র 'The Origin and History of Politics' (1931)।

তুলনামূলক রাজনীতি তত্ত্বের উপর সেই সময় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল তৃতীয় যে গোষ্ঠী তার সবাই ছিলেন প্রথম দিকের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী। বিবর্তনবাদী চিন্তা জনপ্রিয়তা হারানোর ফলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনৈতিক বিবর্তনবাদীরাও তাঁদের মর্যাদা হারান (দুর্ভাগ্যজনক কারণ তাঁদের তাত্ত্বিক ভাবনাগুলি রাজনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত সমকালীন রচনাগুলিতে, বিশেষ ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় রাষ্ট্রস্থাপনা বিষয়ক লেখাগুলিতে এখনও তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়), কিন্তু সেই যুগের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীদের অবদানকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতে থাকে। মনীষীদের এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মোস্‌কা, ম্যাক্স ওয়েবার, প্যারেটো ও মিশেল্‌স। তাঁরা সকলেই বড়মাপের তত্ত্ব গঠন করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকটিই ছিল বাস্তবভিত্তিক। তাঁদের চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল কর্তৃত্বের ধরন ও ক্ষমতার বাস্তব সম্পর্কগুলি। এগুলি সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা আনুষ্ঠানিক রাজনীতির চৌহদ্দি অতিক্রম করে সমাজ, রাজনৈতিক দল, উপচারিক বা অনুপচারিক গোষ্ঠী, 'এলিট' অর্থাৎ উচ্চকোটির মানুষদের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

জেমস ব্রাইস ও কার্ল জে ফ্রেডরিক্স হলেন সেই দু'জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যাঁদের রচনার মধ্যে সেই সময়ের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের প্রবণতাগুলির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'Modern Democracies' (১৯২১) গ্রন্থে ব্রাইস আকৃতিগত বিশ্লেষণ ও আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামোর প্রতি অনুগত থেকেছেন। এর পরেও কিন্তু তিনি রাজনৈতিক দল ও জনমত, এই দুই বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভূমিকাতে যেমন তিনি নিজেই বলেছেন যে তত্ত্ব গঠন তাঁর মূল লক্ষ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হল সত্যকে উপস্থাপিত করা ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া।

তাঁর সমকালীন মনীষীদের পথে না গিয়ে তিনি তাঁর রচনায় 'তুলনামূলক পদ্ধতি' সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা উপযোগী না হলেও রাজনীতির বিধিগুলির এক উৎকৃষ্টতর ভিত্তি নির্মাণে তা সহায়ক হবে। বাস্তব ঘটনায় প্রভেদগুলির তুলনার মাধ্যমে মনুষ্য প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব। সুতরাং ব্রাইস এমন এক তাত্ত্বিক ছিলেন, যিনি অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশ্বাস করতেন। আকৃতিগত বিশ্লেষণের প্রবক্তা হয়েও তিনি একইসঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, অনেক আকৃতিগত অনুসন্ধানই আরও বিস্তৃত কোনও তত্ত্বের জন্ম দিতে সক্ষম। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতি এমন এক ক্রিয়াকলাপ, যা প্রকাশ পায় বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে।

তাঁর 'Constitutional Government and Democracy' (১৯৩৭) গ্রন্থে ফ্রেডরিখ যদিও দেশভিত্তিক

তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, ও আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামোর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর কাজকে অনেকগুলি কাঠামোগত ও ক্রিয়াসংক্রান্ত (functional) শ্রেণির উপর ভিত্তি করা এক তুলনামূলক অনুসন্ধান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তিনি রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলির উপর তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি রাজনীতির কোনও "সূত্র" আবিষ্কারের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন না, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতরে পরিবর্তনশীল উপাদানের সংখ্যা অনেক। তিনি মাঝারি ব্যাপ্তির (middle-range) তত্ত্ব গঠন করেই সন্তুষ্ট ছিলেন (তাঁর রচনা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আচরণ সংক্রান্ত মাঝারি ব্যাপ্তির তত্ত্বের এক উদাহরণ)। রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভুল প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ বুদ্ধির উপর যথেষ্ট নির্ভর করেন। তিনি মনে করেন যে রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধির কার্যকর প্রয়োগ ছাড়া সমাজবিজ্ঞানের কিছু করার নেই। কাজেই তিনি কী করেছিলেন ও কী করতে চাননি, এই দুই ক্ষেত্রেই ফ্রেডরিখ ব্রাইসকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং আধুনিক তুলনাবাদীদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এক ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে তিনি এমন এক জিনিস বেছে নিয়েছিলেন, যা তুলনার খুব অনুকূল ছিল।

তুলনামূলক রাজনীতির প্রতি একদিকে প্রথাগত, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানে ব্রাইস ও ফ্রেডরিখ একটি সেতু হিসাবে কাজ করছিলেন বলা যায়। অবশ্য তথাকথিত 'আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গিটি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের উচিত 'প্রথাগত' দৃষ্টিভঙ্গিটির মূল্যায়ন করা।

আমরা যদি প্রথাগত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে আলাদাভাবে দেখি, তাহলে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব।

প্রথমত, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত আকৃতিগত বা অ-তুলনামূলক (non-comparative)। এতে থাকত কোনো এক রাষ্ট্র সম্পর্কে অনুসন্ধান অথবা অনেকগুলি রাষ্ট্র বা দেশের সমান্তরাল বিবরণ। বিশ্লেষণের মূল বিষয়গুলি রাষ্ট্রের কাঠামো, সার্বভৌমত্বের অবস্থান ও সাংবিধানিক ও আইনি সংস্থান।

দ্বিতীয়ত, আলোচনাগুলি ছিল মূলত বর্ণনাত্মক। ওগ ও জিত্বের 'Modern Foreign Governments' বা র‍্যানি ও বার্টারের 'Magor Foreign Powers' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণনার প্রয়োজনকে খাটো না করেও বলা যায় যে এই লেখকেরা বর্ণনার জন্য নির্বাচনের কোনো শর্তও নির্দিষ্ট করেননি।

এই বর্ণনা সাধারণত দুটি পথ অনুসরণ করেছিল—ঐতিহাসিক ও আইনি। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা নির্বাচনের যথার্থতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কোনো বিশ্লেষণীসূত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা বা আইনি রূপগুলির অন্তরালে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির কোনও ব্যাখ্যামূলক ভিত্তি লক্ষ্য করা যায়নি।

তৃতীয়ত, এই আলোচনাগুলি ছিল অপরিহার্যভাবে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। অর্থাৎ, তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের বিষয় ছিল লেখকের নিজের দেশের থেকে ভিন্ন অন্য কোনও দেশ কিন্তু সেই অন্য দেশটিকে অবশ্যই ইহুদি-খৃষ্টীয় (Judeo-Christian) সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে হত, যে সংস্কৃতি লেখক নিজেও অনুসরণ করতেন। কাজেই তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের বা চর্চার অর্থ ছিল ফ্রান্ত, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন,

সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ, এবং কিছুটা অল্প মাত্রায় স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলি ও স্বায়ত্তশাসিত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন। লেখক মার্কিন নাগরিক না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। অবশ্যই সহজগম্যতা, ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ব করার সুযোগ, নথিবদ্ধ তথ্য ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণ এই ধরনের চর্চার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্তাহীন এশিয়া বা আফ্রিকা শুধু নয়, এমনকি লাতিন আমেরিকাও তুলনামূলর রাজনীতির এই ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারত না। কারণ, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে চর্চা করার সুবিধাগুলি ছাড়াও একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে পশ্চিমী ধারার গণতন্ত্রই হল সর্বোত্তম রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এই ধরনের গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব শুধু পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে অথবা ইহুদি-খৃষ্টীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে। কাজেই, গণতন্ত্র না থাকলেও জার্মানি সম্পর্কে চর্চা করা আবশ্যক কারণ এদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জার্মানিতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির জন্য দায়ী পুঁজিবাদের বিলম্বিত বিকাশ এবং সেখানে গণতন্ত্রের আগমনের জন্য শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই ধরনের সংকীণ৪তার ফলে সৃষ্টি হয় এক বিকৃত বিশ্লেষণের, যা লেখকদের উদ্বুদ্ধ করে পশ্চিম ইউরোপীয় ধারার সংবিধান ও আইনসভাগুলির উপর মাত্রাধিক গুরুত্ব দিতে, যদিও বেশির ভাগ অ-পশ্চিমী (Non-western) ব্যবস্থার কাছে এর মূল্য নেহাত আনুষঙ্গিক।

প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী সক্রিয় শক্তিগুলিকেও উপেক্ষা করেছিল। সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে ভাবনা মনীষীদের এক নিষ্ফলা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। একইভাবে, সাংবিধানিক কাঠামোর উপর মাত্রাধিক গুরুত্ব তাঁদের এক সংকীর্ণ গন্ডিতে বেঁধে রেখেছিল। কারণ, রাজনৈতিক অবস্থাগুলির আন্তঃক্রিয়া ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতা নয়, তাঁদের পছন্দের বিষয় ছিল সংবিধানের আইনগুলি। প্রশাসনের বিকাশকেও সংবিধানের এক উপাঙ্গ বা লেজুড় হিসাবে বিবেচনা করা হত। একইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের আইন মর্যাদাই গুরুত্ব পেত, ক্ষমতার কাঠামোর উপরে তাদের প্রভাব নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও সার্বভৌমত্বের অবস্থানের পটভূমিতে দেখা হত—তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক দিকগুলি আলোচনা করা হত না।

সবশেষে, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মনোগ্রাফিক, অর্থাৎ একটি বা একশ্রেণির বিষয়ের উপর লেখা নিবন্ধের মত। ইভর জেনিংস, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, এব্রি ডাইসি, উডরো উইলসন ও অন্যান্য পন্ডিতেরা বহু মনোগ্রাফ রচনা করেছিলেন, যেগুলির বিষয় ছিল নির্দিষ্ট কোনও দেশ বা দেশের কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান। মাকি৪ন রাষ্ট্রপতিত্ব, মার্কিন কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইত্যাদিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হত।

ইতিবাচক দিক থেকে বিচার করলে, এই ধরনের মনোগ্রাফগুলি প্রায়শই আইন সর্বস্বতাকে ছাড়িয়ে যেত ও অরাজনৈতিক বিষয়গুলিকেও বিশ্লেষে র আওতায় আনত। কিন্তু অন্য দিকে, সমস্যাটি আলোচনা করার জন্য কোনো ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের সুসম্বন্ধ বিবরণ বা কোনও পদ্ধতি বিষয়ক আভাসও লক্ষ্য করা যেত না।

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য থাকলেও অসন্তোষের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। আমরা যাদের সনাতনপন্থী আখ্যা দিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু লেখক একই সময়ে

এই প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না ও তাঁরা পরিবর্তনের তাগিদকে প্রকাশ করতে শুরু করেন। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতায় তাঁরা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না, তেমনই তাঁদের চারপাশের পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারাও তাঁরা আলোড়িত বোধ করেছিলেন।

যেমন, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাশিয়াতে কম্যুনিজম ও মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান এই প্রচলিত ধারণার উপর এক চরম আঘাত হানে যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই হল রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির চূড়ান্ত পরিণতি, অন্তত ইউরোপীয় ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে। এই ধরনের অগণতান্ত্রিক বা গণতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থাগুলির উত্থান সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা লাভ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু শুধুমাত্র আইন, সংবিধান বা গণতান্ত্রিক শাসনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না।

এই কারণেই তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি আরও প্রসারিত করে অ-পশ্চিমী ও অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকেও তার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ অনুভূত হয়।

একইভাবে, বর্ণনার প্রয়োজন তখনও থাকলেও এটা বোঝা যায় যে, এই ধরনের বর্ণনার একটা উদ্দেশ্য থাকা উচিত। বর্ণনা হওয়া উচিত ব্যাখ্যামূলক এবং তা যেন বিষয়টিকে বোঝার পক্ষে সহায়ক হয়। ল্যাস্কি, বার্কার, ব্রাইস, ফ্রেডরিখ ও ফাইনারের মত মনীষীরা বুঝে নিলেন যে আকৃতিগত আলোচনা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে সত্যিই সাহায্য করে। কিন্তু সেই সময়ের দাবি ছিল বড়মাপের তুলনা ও তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেই স্থানের ব্যবহার।

জর্জ ক্যাটলিন, চার্লস মেরিয়াম এবং হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল-ও আনুষ্ঠানিক আইনসর্বস্বতাকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁরা এক বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কগুলিকে তুলনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামো নয়, এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাড়তি চিন্তা ভাবনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। সংবিধান-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান, যেমন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকেও দেশের রাজনীতিতে বেশি করে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়—তা সেই দেশটির এক আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রী রাজনৈতিক কাঠামো থাক বা না থাক। এদের ভূমিকাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে রাজনীতির অনুপচারিক দিকগুলির প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে। প্রথমটি হল রাজনৈতিক বহুত্ববাদের (Pluralism) বিকাশ ও জনপ্রিয়তা, যা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর গুরুত্ব হ্রাস করে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের এক নেটওয়ার্কের (network) পটভূমিতে সমাজের গুরুত্বকে তুলে ধরে। দ্বিতীয় কারণটি হল এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়া যে, যে কোনও সমাজে সংবিধান ও রাজনৈতিক প্রথার মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে এবং শুধুমাত্র সংবিধান ও আইন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে না (এমনকি প্রাথমিক স্তরেও নয়)। তাকে নির্ধারণ করে আর্থ-সামাজিক শক্তি (সংগঠিত ও ব্যক্তিগত দুই-ই), নাগরিকদের অভিমত ও মনোভাবের মতো বহু কারণ।

সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব থেকে অন্যান্য সমাজ ও তাদের ধারণামূলক ও পদ্ধতিমূলক উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করে তুলনামূলক রাজনীতির উল্লম্ব প্রসারের (Vartical expansion) এক স্পষ্ট আকাঙ্খাও সেই সময়ে লক্ষ্য করা গেছিল। এই প্রসঙ্গে মোস্কা, মিশেল্‌স, প্যারেটো ও ওয়েবার তুলনামূলক

রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অ-পশ্চিমী ব্যবস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়টির এক অনুভূমিক প্রসারনের (Horizontal expansion) তাগিদ, আমরা আগেই যার আভাস দিয়েছি।

অবশেষে ধারণামূলক শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চাকে আরও সুসম্বন্ধ করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যা তথ্য সংকলন ও পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সামান্যীকরণকে সম্ভব করে তুলত।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই চিন্তা ও তাগিদগুলি মোটামুটি ভাসা-ভাসা ছিল ও কখনওই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেই এগুলি আকার নিতে শুরু করে ও গবেষণার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ১৯৪৫ সালের পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলি প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচকদের অবস্থানকে আরও মজবুত করে তোলে।

১.৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ঘটনাবলি

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিষয়টির ধারা বা ঐতিহ্য সম্পর্কে তুলনাবাদীরা (Comparativist) যে বৌদ্ধিক অতৃপ্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। যুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই ধারায় নির্ণায়ক পরিবর্তন আনার জন্য নেতৃত্ব দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শিক্ষার বিষয় হিসাবে মর্যাদা পেলেও তুলনামূলক রাজনীতির স্থান ছিল নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। তখন এমনকি পরে বিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে বোঝাত মার্কিন রাজনীতির চর্চা বা অধ্যয়ন। এর জন্য যেমন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের নীতি দায়ী ছিল, তেমনই দায়ী ছিল প্রায় বিশ্বব্যাপ্ত এক ধারণা যে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম থেকেই জোর দিত অনুপচারিক রাজনৈতিক কাজকর্ম, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, দল জনমত ইত্যাদির উপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তুলনাবাদ যখন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাধান্য লাভ করে, তুলনাবাদীরা তখনও অনুপচারিক রাজনীতির উপরই জোর দিতে থাকেন। কাজেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার তাঁদের নেতৃত্ব দেওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য দুটি বিষয় তাদের প্রভাবিত করেছিল—দূরবর্তী স্থানে ব্যয়বহুল গবেষণা চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা লাভের বর্ধিত সম্ভাবনা এবং যুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক আন্তর্জাতিক শক্তি হয়ে ওঠার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা, ও তার ফলে মার্কিন সরকারকে তথ্য ও নীতি নির্ধারণমূলক সহায়তা দেবার প্রয়োজন বেড়ে ওঠা।

১৯৪৪ সালে আমেরিকান পলিটিকাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের এক কমিটি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেও স্বীকার করে যে, তুলনামূলক সরকারের চর্চা "বাধ্য হয়েছে প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে, যা রাষ্ট্রগুলির না হলেও, বিশ্বের মানুষদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলছে।" এই কমিটি মেনে নেয় যে (১) "তুলনামূলক সরকার সংক্রান্ত চর্চাকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ রাখা আদৌ যুগোপযোগী নয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো একেও

তার পরিধির প্রসার ঘটিয়ে পদ্ধতিগুলিকে উন্নততর ও পরিশীলিত করে তুলতে হবে ; (২) সনাতনী প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি হোক বা কঠোর আচরণবাদী (behaviourist) পদ্ধতি, এখন সেই অর্থে আর কোনও একক কৌশল নেই যার সাহায্যে কোনও বিদেশি রাজনৈতিক সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপের নাগাল পাওয়া যায়। পদ্ধতি ও পরিকল্পনার মেলবন্ধন প্রয়োজন এবং তা হওয়া উচিত নমনীয় ও পারস্পরিক ভেদশক্তি সম্পন্ন।"

এর কাছাকাছি সময়ে সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল অফ ইউনাইটেড স্টেটস তুলনামূলক রাজনীতির উপরে এক গ্রীষ্মকালীন আলোচনাসভার আয়োজন করে। এই আলোচনাসভার একটি প্রতিবেদন বলা হয় যে, তুলনামূলক রাজনীতি আবর্তিত হয় আবিষ্কৃত সাযুজ্যগুলি, অর্থাৎ ধারণা ও সমস্যার যে বিশ্লেষণমূলক সূত্রগুলি অনুসারে প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলির তুলনা করা সম্ভব হয়, সেগুলিকে কেন্দ্র করে। এর মতে, "এই বিষয়ে সম্ভবত অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানের কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে", যার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ সংগৃহীত তথ্যকে আরোহ-প্রণালী ভিত্তিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে।

এইসব আলোচনা ও ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে আসার সচেতন প্রচেষ্ঠার পরিণতি হিসাবে যুদ্ধোত্তর কালে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চায় তিনটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, বিষয়টির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটিকে (empirical range) আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয় ; দ্বিতীয়ত, এর চর্চা বা অধ্যয়নকে আরও কঠোর ও সুসম্বন্ধ করে তোলার এক উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস করা হয় এবং তৃতীয়ত, রাজনীতির সামাজিক পটভূমির উপর এখন অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অ-পশ্চিমী সমাজগুলির অন্তর্ভুক্তি ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে উপনিবেশবাদের পতন শুরু হয় এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুই বিশাল মহাদেশে বহু স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মার্কিন বিদেশনীতির আর্ন্তজাতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল এইসব অঞ্চলগুলির সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া, যেখানে বেশিরভাগ রাষ্ট্র শুধুমাত্র নতুনই ছিল না, বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা অঙ্গীকারবদ্ধও ছিল না। এইসব নতুন জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। অর্থের বিষয়টি ছাড়াও মার্কিন বিদেশ নীতি এই গবেষণাকে "নীতি-প্রাসঙ্গিক" (policy relevant) করে তোলায় বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য এইসব বাস্তবমুখী দিক ছাড়াও কিছু বৌদ্ধিক কারণ ছিল। যা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এইসব অঞ্চলে গবেষণা চালাতে উৎসাহী করেছিল। যেমন, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁরা এক বড়ো আঘাত পেয়েছিলেন যখন অন্তত পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রের অপরিহার্য বিজয় সম্পর্কে তাঁদের পুরানো ধারণা ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ও পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিজমের বিস্তার যেন রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক সম্পূর্ণ নতুন মডেলের জন্ম দিয়েছিল। তাদের সংগঠন ও কাজকর্ম, স্থিতিশীলতা ও অস্থিরতা তাদের তৃতীয় বিশ্বে প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে এক বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই একই বিবেচনা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তৃতীয় বিশ্ব রাজনৈতিক বিকাশের বাস্তব পর্যবেক্ষণের এক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

এছাড়াও এত বেশি সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপস্থিতিই তুলনা ও বিভিন্ন বক্তব্য ও তত্ত্ব বিকাশ ও পরীক্ষার এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই নতুন পটভূমিতে আকৃতিগত আলোচনার পুরানো অভ্যাসকে আরও ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং তাত্ত্বিক বিচারে নিষ্ফলা মনে হতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক কঠোরতা (Scientific rigour) ঃ আমরা দেখেছি যে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বহু তুলনাবাদী ইতিমধ্যেই তাত্ত্বিক বিচারে অনুপযুক্ত তথ্যের আরোহ-প্রণালী ভিত্তিক সংগ্রহ ও বর্ণনায় অস্বাচ্ছান্দ্য বোধ করছিলেন। ব্রাইস ও ফ্রেডরিখের রচনায় পদ্ধতি সংক্রান্ত অধ্যয়নগুলি আদৌ যথাযথ ছিল না। তা সত্ত্বেও তুলনাকে অর্থবহ করে তুলতে কোনো দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, ওই অধ্যায়গুলি তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের 'বিচিত্র' অঞ্চলগুলিতে সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকদের কাজ দেখাতে পেরেছিল পদ্ধতিগত উপকরণ কীভাবে গবেষণার কাজকে সাহায্য করতে পারে। সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, পরিমাপ যোগ্যতা (qualification), পরিমাপ ও পরীক্ষাভিত্তিক আচরণবাদের অগ্রগতি তুলনাবাদীদের তাদের অ ্যন আরও 'বিজ্ঞানমনস্ক' ও 'কঠোর' হতে উৎসাহিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিতরে প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ (System analysis), কাঠামোগত ব্যবহারিক উপযোগবাদ (Structural functionalism) ইত্যাদি সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোগুলি প্রাধান্য পেতে থাকলে তুলনামূলক রাজনীতির ছাত্ররা মনে করতে থাকেন যে তাঁদের উপশাখাটি এক ধরনের পরীক্ষাগারের কাজ করতে পারে এবং বক্তব্যের সুসমৃদ্ধ বর্ণনা ও পরীক্ষার জন্য এই কাঠামোগুলি ব্যবহার করতে পারে।

সামাজিক পরিমন্ডলের স্বীকৃতি (Recognition of social setting) ঃ তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির সঙ্গে তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পরিচিত একটি সুফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁদের নিজের নিজের দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির তুলনায় তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতির সঙ্গে সমাজের অন্যান্য দিকগুলির বিভেদ অনেক কম। অন্যভাবে বললে, এইসব রাজনৈতিকভাবে "উন্নতিশীল" সমাজে রাজনীতি ও সমাজের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ পশ্চিমী সমাজের থেকে অনেক বেশি গভীর। পশ্চিমী সমাজে রাজনীতির ইতিমধ্যেই এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সীমারেখাকেই তৈরি করে নিজেকে পৃথক রেখেছিল। এটা লক্ষ্য করেই তুলনাবাদীরা শুধুমাত্র সমাজ সম্পর্কেই নয়, সাধারণ ভাবেও রাজনীতিতে সামাজিক পরিমন্ডল বা পরিবেশের ভূমিকার উপর বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। কারণ তাঁদের নিজের নিজের সমাজের ক্ষেত্রেও তাঁরা রাজনীতির স্বনির্ভর চরিত্রের ব্যাপারে সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

এই বৌদ্ধিক উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা। সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকেরা ইতিমধ্যেই সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এখন গ্যাব্রিয়েল আমন্ড ও স্যামুয়েল এইচ বিয়ারের শুরু করা রাজনীতির সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ তুলনাবাদীদের আকর্ষণ করতে লাগল। তাঁরা রাজনীতিতে মূল্যবোধ, চেতনা ও ভাবব্যঞ্জক প্রতীকের ভূমিকা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করলেন, এবং অনুসন্ধান করতে থাকলেন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তি-নাগরিকেরা এগুলি শিখে ফেলে বা 'অন্তঃস্থ অথবা প্রকৃতিগত' করে তোলে।

সামাজিক পরিমন্ডলের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় শুধুমাত্র নতুন নতুন স্বরূপ ও নতুন অনুসন্ধানের

ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। এর ফলে তুলনাবাদীরা পরিমাপ ও পরিমাপযোগ্যতার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার কাজেও সহায়তা পেয়েছিলেন। কারণ প্রায়শই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় অর্থনৈতিক বর্গ, জনসংখ্যা বিন্যাস (demographic pattern) বা আয় ও বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যের মতো পরিবর্তনশীল সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি আরও ভালোভাবে পরিমাণাত্মক আকারে নথিবদ্ধ করা যায়।

এই তিন প্রবণতার সম্মিলিত প্রভাবে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালগুলির প্রাঙ্গণে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে বৌদ্ধিক ও তাত্ত্বিক কাজকর্মের জোয়ার আসে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপের ভয়াবহ ঘটনাবলী দেখে হতাশ হয়ে পড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুদ্ধোত্তর কালে তৃতীয় বিশ্বে উপনিবেশবাদের অবসানের মধ্যে আশার নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছিলেন। এই নতুন রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব ও এইসব নতুন নতুন অঞ্চলে গবেষণা চালানোর আনন্দই তাদের উদ্দীপনার একমাত্র কারণ ছিল না।

গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁদের সৃষ্ট ধারণাগুলি এইসব নতুন রাষ্ট্রগুলিতে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল (তাঁরা ভেবেছিলেন যে প্রতিষ্ঠা পাওয়াটা একরকম নিশ্চিত), তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগও তাঁদের সমানভাবে উদ্দীবিত করেছিল। এর ফলে মার্কিন বিদেশ নীতির সঙ্গে তাদের গবেষণার ল ্যগুলি ঠান্ডা যুদ্ধের সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে সমাপতিত (overlapped) হচ্ছিল। এইভাবে দেখলে, উইয়ার্ডা যেমন বলেছেন, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা তুলনামূলক রাজনীতি "শুধুমাত্র এক নতুন পণ্ডিতসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, তা রাজনৈতিক ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছে দেবারও চেষ্টা করত।"

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে "আচরণবাদী বিপ্লব" ("behavioural revolution") ঘটে যায়, তা তুলনাবাদীদের প্রচুর প্রেরণা দিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ডেভিড ইস্টন দিশালী গ্রন্থ 'The Political System' রাজনীতির এক নতুন ব্যাখ্যাকে জনপ্রিয় করে তোলে। ইস্টনের মতো, রাজনীতি এমন এক ক্রিয়াকলাপ যা কয়েকটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সমগ্র সমাজের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরবর্তী রচনাগুলিতে তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের এক সাধারণ কাঠামো গঠন করেন, যা রাজনীতিকে এক প্রক্রিয়া বা প্রবাহ হিসাবে ধরে নয়, যেখানে রাজনীতি ও সমাজ যোগান (input) ও ফলন (output) হিসাবে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে। এর ফলে রাজনীতির পরিধি নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়। স্থায়িত্বে প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা ও রাজনীতির এক বহুত্ববাদী মতের মাধ্যমে এ সুন্দরভাবে যুগের মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলে এবং কিছু মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতেও সহায়তা করে।

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের তুলনামূলক রাজনীতি সংক্রান্ত কমিটির অধ্যক্ষ হয়ে গ্যাব্রিয়েল আমন্ড সমাজতাি ক ট্যালকট পারসন্স-এর বিশ্লেষণী কাঠামো দ্বারা গভীরভাবে প্রবাবিত হয়ে পড়েন। পারসন্স-কে অনুসরণ করে তিনি উন্নত (developed) ও অল্পোন্নত (Underdeveloped) দেশগুলির বৈষম্যের এক আদর্শ প্রকৃতির (Ideal type) মডেল গড়ে তোলেন। এই মডেল অনুযায়ী, অল্পোন্নত দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল আরোপ (ascription), একনিষ্ঠ আনুগত্য (Particularism) ও সনাতনী প্রথা

(Tradition) ও উন্নত দেশগুলির চিহ্ন হল সাফল্য বা কীর্তি (Particularism) ও সনাতনী প্রথা (Tradition) ও উন্নত দেশগুলির চিহ্ন হল সাফল্য বা কীর্তি (achievement), বিশ্বজনীনতা (universalism) ও আধুনিকত্ব (Modernity)। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি তাঁর ধারণাগুলি গড়ে তুলতে থাকেন ও ১৯৬০ সালে জেমস কোলম্যান-কে সহ-সম্পাদনার দায়িত্ব রেখে 'The Politics of Developing Areas' প্রকাশ করেন। নতুন চেহারায় তুলনামূলক রাজনীতির অগ্রগতির পথে এই গ্রন্থটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন বা কীর্তিস্তম্ভ। আমন্ডের কাছে উন্নয়ন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিষয় ছিল না, তা ছিল এক নৈতিক লক্ষ্য—উদীয়মান দেশগুলিকে যে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তুলনাবাদীদের।

আমন্ড-বোলম্যানের গ্রন্থটির সঙ্গে একই বছরে প্রকাশিত ডব্লু ডব্লু রোসটাও-এর 'Stages of Economic Growth' এই চিন্তা ধারাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। রোসটাও দাবি করেন যে উন্নত অবস্থায় পৌঁছতে সব দেশকেই একই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সুতরাং তাঁর কাছে উন্নতির অর্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাশ্চাত্যকরণ (Westernization)। এই ধারণা আরও সমর্থন পায় ড্যানয়েল লেরনা -এর 'The Passing of Traditional Society' (১৯৫৮), কার্ল ডয়েশ-এর উদ্ধৃত 'Social Mobilization and Political Development' (১৯৬২) ও এস এম লিপসেট-এর 'Political Man' (১৯৫৯) রচনাগুলি থেকে।

এই রচনাগুলি কাজেই এক "সাধারণ আন্তর্জাতিক তুলনামূলক কাঠামো' ও "উন্নয়নের এক বিশ্বজনীন সমাজ বিজ্ঞান" উপস্থাপিত করেছিল, যা শুধুমাত্র উন্নয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাহায্য করত না, বরং আশা কর হত যে তা নতুন দেশগুলিতে উন্নয়ন ও গণতন্ত্র আনতেও সফল হবে।

বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততা ও নৈতিক যথার্থতার সমন্বয়ে গঠিত উন্নয়ন তত্ত্ব শীঘ্রই ১৯৬০-এর দশকের আশাবাদী ঢেউয়ের শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছিল, যার পিছনে সমর্থন যোগাচ্ছিল কেনেডি ও জনসন প্রশাসনের 'শান্তি বাহিনী-সুলভ মেজাজ' ('the peace corps mood') ও 'মহৎ' সমাজ' (Great society) দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়াও, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনামূলক রাজনীতির ছাত্রদের কাছে তা প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও শীঘ্রই এই ছাত্রের দল উন্নয়ন তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ (assumption), ধারণা ও শ্রেণি বা বর্গকে হাতিয়ার করে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই উন্নয়ন তত্ত্বের সমস্যাগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই তত্ত্বের মতে উন্নয়নের অর্থ হল পাশ্চাত্যকরণ। অর্থাৎ উন্নয়নকে মাপার শর্তগুলি সবই নির্ধারণ করা হয়েছে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে। পাশ্চাত্যে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও উদারপন্থী বহুত্বের পিছনে যাদের অবদান আছে বলে মনে করা হয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বে সেইসব উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজার, এমন কী না পাওয়া গেলে সৃষ্টি করে নেওয়ারও প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এই দিক থেকে বিচার করলে, 'উন্নয়ন' শীঘ্রই জাতিকেন্দ্রিকতার (ethnocentrism) অন্য একটি নামে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, কাঠামোগত-ব্যবহারিক উপযোগবাদী (Structural Functional) স্বতঃসিদ্ধ এই নতুন তুলনাবাদীদের তৃতীয় বিশ্বে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তত্ত্ব নির্দেশিত কাঠামো ও ব্যবহারিক উপযোগের সন্ধান করতে শিখিয়েছিল, যেখানে সেই দেশগুলির সাংস্কৃতিক সুনির্দিষ্টতা বা ঐতিহাসিক পটভূমির কোনোও গুরুত্ব বা ভূমিকা ছিল না। এর ফলে তাঁদের গবেষণায় প্রয়োজনের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল যাদের তাঁরা মনে করেছিলেন, "স্বার্থের সমষ্টি তৈরি করা" ("interest aggregating) প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ রাজনৈতিক দল অথবা 'স্বার্থ ব্যক্ত করা' প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি। আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যম, কৃষি সংস্থার ইত্যাদি বিষয়ও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এ নয় যে অনুসন্ধানের এই ক্ষেত্রগুলি গুরুত্বহীন ছিল বা তাঁদের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুগুলি কাজ করছিল, সেগুলিই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। যেখানে প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি নির্দেশিত কাজগুলি সম্পাদন করত না, তুলনামূলক রাজনীতির পণ্ডিতেরা সেই দেশের রাজনীতিকে "ত্রুটিপূর্ণ" (dysfunctional) আখ্যা দিতেন, কিন্তু তত্ত্বটিকে অনুপযুক্ত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করতেন।

এর ফলে উন্নয়ন তত্ত্বকে শীঘ্রই পক্ষপাতদুষ্ট, জাতিকেন্দ্রিক ও অ-বিশ্বজনীন (non-universal) বলে গণ্য করা হতে থাকে। উন্নয়ন তত্ত্বের কাঠামোগত ব্যবহারিক উপযোগবাদী ভিন্ন রূপটিও সুস্পষ্ট ও অপরিশীলিত মনে হতে থাকে। এই তত্ত্বের সমালোচনায় মুখল হয়ে ওঠেন মার্কসবাদীরা, যাঁরা শ্রেণি সংঘাত, নয়া উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিক নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। অঞ্চল বা দেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাও এই তত্ত্বের সমালোচনায় নামেন। তাঁদের মতে, বিশ্বজনীনতার দাবির আড়ালে বিশেষ কোনও দেশের সাংস্কৃতিক সুনির্দিষ্টতা বা ঐতিহাসিক পটভূমিকে সরিয়ে দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

রাজনীতির বাস্তব ক্ষেত্রেও উন্নয়ন তত্ত্ব বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নিক্সন ও ওয়াটার গেট এবং তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে সামরিক অভ্যুত্থান—এই সবই উন্নয়ন তত্ত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এক নিশ্চিত গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই সময়েই স্যামুয়েল হান্টিঙটন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Political Order in Changing Societies' (১৯৬৮) প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি বলেন যে সামাজিক চলনশীলতা ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার বদলে দুর্বল করে তুলতে পারে। হান্টিঙটনের গবেষণাপত্রটি বহুল স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যেই উন্নয়ন তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে ও ১৯৭০-এর দশকে তুলনামূলক রাজনীতি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে রাষ্ট্র ও অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর জোর দিয়ে মোটামুটিভাবে ও সাধারণ বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর (যাদের মধ্যে তুলনাবাদীরাও ছিলেন) কাছে মার্কসবাদ প্রাধান্য পেলেও, ১৯৭০-এর দশকে বিশেষ করে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে একটি ছিল কর্পোরেটবাদ (Corporatism) এবং অন্যটি নির্ভরতা তত্ত্ব (dependency theory)। উন্নয়ন তত্ত্বের মত বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে আস্থা না রেখে কর্পোরেটবাদ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত স্বার্থগুলির মধ্যস্থতাকারী এক ব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপিত করে তাকে উন্নতিশীল ও অনুন্নত দেশগুলির বাস্তব জমির কাছাকাছি বলে ঘোষণা করে। এদিকে নির্ভরতা তত্ত্ব

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রচ্ছন্ন কার্যকলাপের পরিণতি হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নত পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং কোনও শক্তপোক্ত গণতন্ত্রের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত মেন করে না।

এইসব নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বের সংখ্যাবৃদ্ধি তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাবনাগত ও তাত্ত্বিক খন্ডীকরণের (fragmentation) সূচনা করে। আজ পর্যন্ত যদিও এমন কোনও সংকেত মেলেনি যে ১৯৬০-এর দশকের সেই "ঐক্য ও আশাবাদ"-এর যুগে আমাদের ফিরে যাওয়া সম্ভব, দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈচিত্র্য কিন্তু পন্ডিতদের কাছে সুযোগ এনে দিয়েছে বাস্তবসম্মত হয়তো বা বিবিধগ্রাহী (eclectic) প্রক্রিয়ার তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচন করে নেবার।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের এক সর্বজনস্বীকৃত 'বিজ্ঞানসম্মত' কাঠামো গড়ে ওঠার যে ব্যাপক আশার সঞ্চার হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। তবুও গত পঞ্চাশ বছরে যা ঘটেছে, তার সবটাই বিফলে যায়নি। বিশিষ্ট তুলনাবাদী সিডনী ভার্বা এইসময়ের বেশ কয়েকটি সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

যেমন, পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশে পৌঁছে যাওয়া তুলনামূলক রাজনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর তুলনামূলক রাজনীতির প্রথম ঢেউটি অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির উপর গুরুত্ব দিলেও সা তিক রচনাগুলি উন্নতিশীল দেশগুলির বহু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ সবদিকে সমান মনোযোগ দেবার এক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই আমলাতান্ত্রিক আচরণ বোঝার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও জার্মানির মত পন্ডিতেরা এখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিরও শরণাপন্ন হতে পারেন। গণতান্ত্রিক দল পার্টি ব্যবস্থার মডেল গড়ে তোলার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে হল্যান্ড বা বেলজিয়ামের থেকে ভারত কোনো অংশে কম নয়। রা গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা ও তৃতীয় বিশ্বে আজকের ঘটনাগুলির পর্যবেক্ষণ করার জন্য পশ্চিম ইউরোপে ওই একই প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রয়োজন বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, পন্ডিত বা গবেষকরা এখন নানান দৃষ্টিভঙ্গি ও বহু পরিবর্তনশীল উপাদানের অস্তিত্বের বিষয়টি খোলা মনে দেখেন। রাজনীতির গঠনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতির উপাদানগুলির গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী মডেলে ব্যাখ্যামূলক পরিবর্তনশীল উপাদান হিসাবে রা কে উপেক্ষা করার ত্রুটিকে সংশোধন করা হয়েছে এবং জন-নীতি বিশ্লেষণ বা নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে, রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক তুলনামূলক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

তৃতীয়ত, তুলনামূলক গবেষণার পদ্ধতিগত দিকগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছে। সমীক্ষা, গবেষণা, সমষ্টিমূলক তথ্য ও সময়-মালা (time series) বিশ্লেষণের অবদান ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করছে। পরিমাণগত ও গুণগত কৌশলের তুলনামূলক যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে, কিন্তু বহু তুলনাবাদী তাঁদের গবেষণার প্রয়োজন মেটাতে সচেতনভাবে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁদের গবেষণার প্রয়োগ করা তুলনামূলক অনুসন্ধানের যুক্তি সম্বন্ধে আজ তুলনাবাদীরা আরও বেশি অবহিত। একইভাবে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গবেষণার উপর ধারাবাহিক গুরুত্ব তুলনামূলক গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ

করে চলেছে। এই সময়ে, বিশেষত মাঝারি বিস্তারের (middle-range) সামান্যীকরণে আগ্রহ এখন তুলনামূলক গবেষণার এক স্বীকৃতি লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়েছে। একে নিশ্চিতভাবে তুলনামূলক অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধান এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক তত্ত্বের সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতি বলে মানা যেতে পারে।

সবশেষে, তাঁদের গবেষণার অধীন সমস্যাগু ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তুলনাবাদীরা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিশোধনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যদি গবেষ ার কোনও একক, সর্বজনস্বীকৃত ছাঁদকে পরিত্যাগ করে তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলনামূলক রাজনীতির দুর্বলতা নয়, শক্তির লক্ষণ হিসাবেই দেখতে হবে। তুলনামূলক রাজনী তর প্রবক্তাদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভাজন না ঘটিয়ে এই তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য আরও বাস্তবমুখী ও উন্মুক্ত (open-ended) নির্বাচনের সুযোগ এনে দেবে—আমরা এরকম আশা করতেই পারি।

১.৫ ভারতে তুলনামূলক রাজনীতি

শুধুমাত্র স্বাধীনতার পরেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক স্বতন্ত্র অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে মর্যাদা পায়। দুএকটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৭ সালের পরে। (ভারতের অন্যতম প্রাচীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৪৮ সালে)। পরবর্তী তিন দশকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা—যেমন ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সরকারি প্রশাসন—বিকাশ লাভ করলেও তুলনামূলক রাজনীতির শাখাটি উপেক্ষিত থেকে যায়। (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সরকারি প্রশাসনের শাখাগুলি তখন ভারত-কেন্দ্রিক ছিল এবং এখনও রয়েছে।) একথা যদিও সত্যি যে তুলনামূলক রাজনীতিকে তুলে ধরার জন্য বিশেষত ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের গবেষকদের যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন ছিল তা করাও হয়ে ওঠেনি, তবুও অন্যান্য সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহের অভাবও লক্ষ্য করা গেছিল। অন্যথা এর ব্যাখ্যা করা কঠিন হবে কেন আর্থিক সংস্থান থাকলেও ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক গবেষণা প্রকল্পগুলিতে উৎসাহ দেননি অথবা হাতের কাছে প্রয়োজনীয় কৌশল মজুত থাকলেও বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও তার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেননি।

এটা সম্ভবত স্বাভাবিক ও মার্জনাযোগ্য ছিল যে ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভারতীয় রাজনীতি ও সংবিধান নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিলেন, কারণ ওই দুটি ক্ষেত্রে অনেক নতুন ও পরীক্ষামূলক উপাদান ছিল। অবশ্য পণ্ডিত বা গবেষকদের যদি তুলনামূলক অনুসন্ধানের অর্থের উপর যথেষ্ট দখল থাকত, তবে সুসম্বন্ধ অন্তর্দেশীয় 'within-nation' তুলনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে ওই চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁরা তুলনামূলক অনুসন্ধানের সমন্বয় ঘটাতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠেনি।

এই সব কারণে ভারতে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে ধীরগতিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কে এক সমীক্ষার (১৯৮১) অঙ্গ হিসাবে রজনী কোঠারি এই উপশাখাটির প্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। তাঁর মতে, তুলনামূলক রাজনীতির শিক্ষাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে "সংবিধান, সরকারি কাঠামো, সরকারি প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্কহীন কথার মালা" ও গবেষণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছে "আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক-প্রাসঙ্গিক ধরনের বর্ণনাভিত্তিক কন্ডিত গবেষণার

সমস্ত ব্যঞ্জনা নিয়ে এক আঞ্চলিক অনুসন্ধানে, যা দুর্বল সাংবাদিকতার এক ভদ্রোচিত নাম ছাড়া কি ই নয়।"

এক পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার পরে কোঠারি গবেষণার কাজগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন)ঃ

(১) আঞ্চলিক তুলনা

(২) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(৩) যুগ্মিত তুলনা (paired comparison)

(৪) সহযোগিতামূলক গবেষণা ও

(৫) অন্তর্দেশীয় গবেষণা।

আঞ্চলিক তুলনার ক্ষেত্রে কোঠারি বেশ কয়েকটি রচনার উল্লেখ করলেও রাধাকমল মুখার্জির 'Democracies of the East : a study in comparative politics, 1962) ছাড়া কোনোটিকেই তুলনামূলক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। মুখার্জির রচনাটি দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য : তিনি এককভাবে আলাদা আলাদা দেশগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেননি এবং দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ও "সাম্প্রদায়িক" সমাজের প্রাচ্যদেশীয় প্রথার বৈষম্য বোঝানোর প্রয়াসে তিনি এক ভাবনা-মুখী বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোঠারি যুক্তরাষ্ট্রীয়, "প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতান্ত্রিক" রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি সংক্রান্ত তত্ত্ব বা মডেলকে কেন্দ্র করে গঠিত কিছু রচনার সন্ধান পান, যেগুলিতে তত্ত্ব বা মডেলগুলি ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা করার জন্য ভারতীয় নমুনাগুলির সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণিটি, অর্থাৎ যুগ্মিত তুলনা, দুটি বেছে নেওয়া দেশের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি চিহ্নিত করে তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও সমস্যাগুলি পরীক্ষা করার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে একটি দেশ সাধারণত ভারত। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের থেকে বেশি সংখ্যায় অর্থনীতিবিদরাই ভারত ও চিনের পরিকল্পনা পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ বা কৃষিক্ষেত্রে এই দুই দেশের প্রগতি নিয়ে গবেষণা করেছেন অথবা আবার ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সাধারণত এক একটি দেশকে নিয়ে পৃথকভাবে এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, যদিও অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে কৃ াঙ্গ ও ভারতে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এক তুলনামূলক আলোচনা, যা পাওয়া যায় সিডনী ভার্বা, বসিরুদ্দিন আহমেদ ও অনিল ভাটের 'Caste, Race and Politics' (১৯৭৩) গ্রন্থে।

কোঠারি লক্ষ্য করেন যে সহযোগিতামূলক গবেষণা (বিভিন্ন ক্ষেত্র বা শাখা থেকে আসা বেশ কিছু গবেষকের প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়ে এবং বাধ্যতামূলক না হলেও, সম্ভব হলে বিভিন্ন দেশের গবেষকদের একত্র করে) ও অন্তর্দেশীয় তুলনা (বিশাল আয়তন ও বৈচিত্র্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বা ইউনিটকে তুলনার বিষয় করা যেতে পারে) উভয়েই তত্ত্ব ও পদ্ধতির এক সন্তোষজনক অনুশীলন হতে পারে।

কোঠারির এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ভারতে তুলনামূলক রাজনীতি-সংক্রান্ত গবেষণার দুর্বলতা ও সম্ভাবনাগুলিকে ভালভাবে প্রদর্শন করতে অক্ষম হয়েছে। এই উপশাখাটির ভারতে আশানুরূপ বিকাশ না হওয়ায় আমাদের উচিত অন্তর্দেশীয় তুলনা ও ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য এটি এক বিশাল সম্ভাবনাময়

ক্ষেত্র। সৌভাগ্যবশত কোঠারির সমীক্ষার পরে এই দুটি দিকেই কাজ হয়েছে। প্রথম দিকটির এক উদাহরণ হল বিপ্লব দাসগুপ্ত ও ডব্লু এইচ মারসি-জোনস-এর 'Patterns and Trends in Indian Politics (1975) ও দ্বিতীয় প্রকৃতির একটি দৃষ্টান্ত হল উর্মিলা ফাড়নিশের 'Ethnicity and Nation-Building in South Asia (1989)।

অবশ্য গবেষণার এই সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে ভারতীয় তুলনাবাদীদের তাদের উত্তর আমেরিকান ও ইউরোপীয় সহকর্মীদের মত তুলনামূলক রাজনীতির তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত গাঁথুনিগুলি (underpinnings) সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। এই দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রদের কাছে তুলনামূলক রাজনীতির সাফল্য ও সম্ভাবনাগুলির সঙ্গে আরও বেশি করে পরিচিত করে তোলা।

১.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(1) David Easton : The Political System : An Inquiry into the State of Political Science (New York : Knotp. 1953)

(2) Gabriel Almond and James Coleman (eds) : The Politics of the Developing Areas (Princeton, NJ : Princeton University Press 1960)

(3) Harry Exkstein : A Perspective of Comparative Politics : Past and Present and

(4) Roy Macridis : 'A survey of the Field of Comparative Government' in Eckstein and Apter (eds).
'Comparative politics — A Reader' (New York : Free Press. 1963)

(5) Sydney Verba : 'Some Dilemmas in Comparative Research'. World Politics 20 (October 1967) : 111-127.

(6) Gabriel Almond : 'Political Development : Essays in Heuristic Theory' (Boston : Little Brown. 1970),

(7) Ronald Chilcote : Theories of Comparative Politics (Boulder : Westview. 1981)

(8) Russel J. Dalton : "Comparative Politics of the Industrial Societies' and

(9) Barbara Geddes : 'Paradigms and Sand Castles in the Comparative Politics of Developing Areas' in William Crotty (ed.) Political Sceience : Looking to the Future. Vol. 2. Comparative Politics, Policy and International Relations (Evanston : Northwestern University Press. 1991).

(10) Howard J. Wiarda : 'Comparative Politics : Past and Present' and

(11) Sydney Verba : 'Comparative Politics : Where Have We Been, Where Are We going?' in Howard J. Wiarda (ed.) New Directions in Comparative Politics (Boulder : Westview 1991)

(12) Daniel P. Franklin and Michael J. Baun (eds.) 'Political Culture and Constitutionism—A. Comparative Approach (New York. ME Sharpe. 1995)

একক ২ তুলনামূলক পদ্ধতি ও কৌশল

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতি

২.৩ তুলনামূলক রাজনীতি বিষয় ও পদ্ধতি

২.৪ তুলনার কৌশল

২.৫ তুলনামূলক গবেষণার নকশা

২.৬ তুলনামূলক গবেষণার উপযোগিতা

২.৭ তুলনামূলক রাজনীতি তত্ত্ব

২.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২.১ ভূমিকা

তুলনা এক স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি। আমারা যখন বলি যে 'ক' দীর্ঘকায় বা 'খ' দরিদ্র বা ভারতের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কম বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক শক্তিশালী দেশ বা গত চল্লিশ বছরে বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে কোনও যুদ্ধ হয়নি—তখন এই সদর্থক বিবরণগুলির প্রত্যেকটিতে একটি তুলনামূলক প্রসঙ্গ নিহিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' দীর্ঘকায় বলার অর্থ দুই ধরনের মানুষ আছে—দীর্ঘকায় ও খর্বকায়, এবং 'ক' দ্বিতীয় শ্রেণির না হয়ে প্রথম শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। আমরা সর্বদা এই ধরনের কথা বলে থাকি। এই ধরনের বিবৃতির ক্ষেত্রে তুলনামূলক প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে : তা কোনও ব্যক্তি বা দেশ বা ঐতিহাসিক সময় ইত্যাদি বিবৃতির বিষয়গুলির অবস্থানের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। কোনও কিছু বোঝার জন্য তুলনা কাজেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তুলনা করা হয়ে বৈসাদৃশ্যের মাধ্যমে, এবং স্পষ্ট বা নিহিত যে ধরনেরই হোক না কেন, বৈসাদৃশ্য ছাড়া কোন সংজ্ঞা বা ধারণার কাজ চালানোর মত সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তুলনা একই উদ্দেশ্য সাধন করে। যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও একথা স্বীকার করে এসেছেন। আমাদের যুগে জেমস কোলম্যান যেমন বলেন, "তুলনা না করলে তুমি বিজ্ঞানসম্মত হতে পারনা।" রজনী কোঠারিও বলেন, "রাজনীতির অর্থবহ অধ্যয়ন করতে হলে তা করা উচিত তুলনামূলক প্রক্রিয়ায়"। একইভাবে তুলনামূলক রাজনীতির আর এক ছাত্র পিটার এইচ মার্কল বলেন "দেশের, বিদেশের, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্যক উপলব্ধির জন্য পরিশীলিত তুলনার কোনও তুলনা নেই।"

এই দিক থেকে বিচার করলে, সমস্ত রকমের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মৌলিক উপাদান হল তুলনা।

তা সত্ত্বেও, যে শাখাটি বিশেষ করে সরকারের বিভিন্ন প্রকৃতির বা বিভিন্ন দেশের রাজনীতির ধরনের তুলনামূলক আলোচনা করে, তারই নামকরণ করা হয়েছে তুলনামূলক রাজনীতি।

রাজনীতির সুসম্বন্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত আলে চনার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় তুলনামূলক রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরি ত হয়েছে। কোনও সমাজবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদি আন্তঃসম্পর্ক বা কারণবাচক (causal) সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে চান, তাঁকে ভিন্নতার খোঁজ করতেই হবে। দেশ বা অন্য যে কোনও উপযুক্ত স্তরেই হোক, তুলনার মাধ্যমেই শুধুমাত্র এই ভিন্নতাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো যায়। একইভাবে, কেউ যদি কোনও অনুমিতিকে যাচাই করতে চায় বা কোনও সাধারণ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন সেই অনুমিতি বা বক্তব্যের বৈধতার মূল্যায়নের জন্য তুলনাই একমাত্র উপায়।

২.২ তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতি

তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতি—এই দুটি নামের যথার্থতা নিয়ে গবেষক বা ছাত্রদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। আমাদের কি করা উচিত শুধুমাত্র প্রথমটি বা দ্বিতীয়টি ব্যবহার করা অথবা পরিবর্ত বা সংযুক্তভাবে দুটিই ব্যবহার করা ?

প্রকৃতপক্ষে, অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের প্রেক্ষাপটে এই দুটি নামকে আরও ভালভাবে বোঝা সম্ভব।

একটা সময় ছিল যখন তুলনাবাদীদের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সরকারের আইনি কাঠামো ও বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাগুলি (সাধারণত পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলির)। কাউকে তুলনামূলক সরকারের ছাত্র বলা হত যখন সে অন্য একটি দেশের (অথবা অনেকগুলি দেশের) সরকারি কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন করত। তুলনামূলক সরকার বিষয়ে এই পঠনপাঠনে গুরুত্ব পেত সংবিধান বা মৌলিক আইন, সরকারের নির্বাহী (executive) আইন ও বিচার বিভাগীয় শাখাগুলি, প্রশাসনিক আইন ও সম্ভবত রাজনৈতিক দলগুলি।

এইসব উপাদানগুলি নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক ছিল এবং এখনও রয়েছে। কাজেই, তুলনামূলক সরকারকে তুলনামূলক রাজনীতিও বলা যেতে পারত, অবশ্যই কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে। রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হবার সঙ্গে আমরা সরকারকে রাজনীতির শুধুমাত্র একটি অঙ্গ হিসাবেই বিবেচনা করতে শিখেছি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনীতি সম্পর্কে এই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবং এর সাথে সাথে তুলনামূলক রাজনীতি নিজের জায়গা করে নেয়। অন্যটির সঙ্গে বা ঘটনাবলীর এক বিস্তৃততর ক্ষেত্র সম্পর্কে চর্চা করে, যার মধ্যে যেমন রয়েছে জাতীয়, প্রদেশিক ও স্থানীয় সরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, তেমনই আছে রাজনৈতিক দল, শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও সংস্থার মতো সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সংগঠন ও নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত, অনুসন্ধানের বিষয়টি অভিন্ন হলে তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতি মোটামুটিভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক। আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের

বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে এক তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহলে তুলনামূলক সরকার যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, সেগুলি হল এই দুই দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাগুলির গঠন ও ক্রিয়াকলাপ, নিজস্ব সংবিধানগুলিতে তাদের অবস্থান ও ভূমিকা, সরকারের অন্যান্য বিভাগগুলির সঙ্গে তাদের সংবিধানস্বীকৃত সম্পর্ক, তাদের বিধিবদ্ধ কার্যপ্রণালী, ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে তারা কীভাবে নিজের নিজের দেশের সংবিধানগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে ইত্যাদি। অন্যদিকে, তুলনামূলক রাজনীতি আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে, যেমন পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক স্রোত ও বিচার বিভাগীয় আচরণের আন্তঃক্রিয়া, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে বিচার বিভাগীয় আচরণকে প্রভাবিত করে বা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, সরকারের প্রতি জনগণের মনোভাবে বিচার বিভাগের প্রভাব কী, রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রকে এই দুই দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা কতখানি প্রতিফলিত করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনীতি সম্পর্কে তুলনামূলক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ও আনুষ্ঠানিক। অন্যদিকে রাজনীতি সম্পর্কে তুলনামূলক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিস্তৃত ও চরিত্রের দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক তথা অনুপচারিক (formal-cum-informal)। এতে রাজনীতি অন্তর্ভুক্ত হয় কাঠামো ও প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব ও অনুগামীত্ব, মনোভাব এবং মতামত ও আচরণ, বিধি ও প্রয়োগ—এই সবকটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই। অবশ্যম্ভাবীরূপে, আনুষ্ঠানিক ও সুনির্দিষ্ট সরকারের নিস্তরঙ্গ জলাভূমি ছেড়ে তুলনামূলক রাজনীতিকে ঝাঁপাতে হয় বিরামহীন আন্তঃক্রিয়ার এই জটিল নকশাকে আয়ত্ত করতে ও তার থেকে বিভিন্ন দেশ ও পটভূমিতে রাজনীতির অর্থ আবিষ্কার করতে তুলনামূলক রাজনীতির ছাত্ররা বাধ্য হয়েছে তাদের ভাবনাচিন্তা ও প্রয়োগের হাতিয়ারগুলিকে আরও ধারালো করে তুলতে।

২.৩ তুলনামূলক রাজনীতি ঃ বিষয় ও পদ্ধতি

বিষয় ঃ তুলনামূলক রাজনীতির দুটি উপাদান আছে—বিষয় ও পদ্ধতি। বিষয়ের ক্ষেত্রটিতে অবশ্য একটা সমস্যা রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিষয়টি ক্ষেত্রের নামের মধ্য দিয়েই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে—যেমন রাষ্ট্রচিন্তা (political throught), আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক (international relations) বা সরকারি প্রশাসন। কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়টি তার নাম থেকে বুঝে ওঠা কঠিন। ফিলিপ সি স্মিটার তুলনামূলক রাজনীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে : "বিষয় হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভ্যন্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণার একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যা সচরাচর অন্য দেশ বা অন্য মানুষদের রাজনীতির প্রতি মনোযোগী।"

অর্থাৎ, যখনই কেউ নিজের দেশের বাইরে কোনও দেশের রাজনীতি অধ্যয়ন করে, আমরা তখন বলতে পারি যে সে তুলনামূলক রাজনী তর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নামটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে এবং এর ফলে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মার্কিন রাজনীতি ও তুলনামূলক রাজনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দু'টি পৃথক শাখা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তুলনামূলর রাজনীতি স্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবশ্য কিছু সমস্যা রয়েছে। এখানে বলা হয় না অন্য দেশের রাজনীতির কোন নির্দিষ্ট দিকটি অধ্যয়ন করতে হবে—তা যে কোনও একটি বা সবকটি দিকই হতে পারে। এছাড়াও, কারুর অধ্যয়নের বিষয়কে তুলনামূলক

রাজনীতির বিধির ভিতরে আনতে গেলে তাকে কি অনিবার্যভাবেই বেশ কয়েকটি দেশের তুলনা করতে হবে না ? যুদ্ধোত্তর কালে আকৃতিগত অধ্যয়নের থেকে তুলনা বেশি গুরুত্ব পেলেও এক-দেশীয় (single-country) অধ্যয়নের প্রথা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত।

তৃতীয়ত, নিজের দেশের বাইরে অন্য কোনও দেশ সম্পর্কে অধ্যয়ন করার বিধিটি খুব কঠোরভাবে মেনে চলা হয় না। ডেভিড ট্রুম্যানের 'Governmental Process' মার্কিন গোষ্ঠী প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রচনা হলেও তা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনামূলক রাজনীতির পাঠক্রমে সহজেই জায়গা করে নেয়। এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়া যায়।

কাজেই, তুলনামূলক রাজনীতির প্রকৃত আলোচ্য বিষয়টিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা শুধু কঠিন নয়, হয়তো অসম্ভবও। একজন তুলনাবাদী অধ্যয়ন বা শিক্ষাদানের জন্য কত বিভিন্ন ধরনের বিষয় বেছে নিতে পারেন, তার একটি ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে কয়েকটি প্রকাশনার কথা উল্লেখ করছি, যেগুলি তুলনামূলক রাজনীতি নামের কোন ক্ষেত্রের অধীনে সহজেই অন্তর্ভুক্তি দাবি করতে পারে ঃ Representation in Italy (S. Barnes, 1977), Organizing Interests in Western Europe (S. Berger, ed. 1981). Education and Political Development (Coleman, 1965) Representation in France (Converse and Pierce, 1986), Political Oppositions in Western Democracies (Dahl, ed. 1966), Electoral Change in Advanced Industrial Democracies (Dalton etab, eds., 1984), Coalitions in Parliamentary Government (Dodd, 1976), Unions and Economic Crisis (Government (grant, 1987), The Politics of Accomodation : Pluralism and Democracy in the Netherlands (Lijphart, 1975), Corporations and Change : Austria, Switzerland and the Politics of Industry (Katzenstein, 1984), Political Survival : Politicians and Pyblic policy in Latin America (Ames, 1987), Beyond the Mricale of the Market : The Political Economy of Agrarian Development in Kenya (Bates, 1989), Economic Policy Making and Development in Brazil (Leff, 1968), The Politics of Oil in Venezuela (Tugwell, 1975), The State and the Poor : Public Policy and Political Development in India and the United States (Echeverri—gent, 1993)

লক্ষ্যহীনভাবে বেছে নেওয়া এই গ্রন্থগুলি যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়টিকে এগুলি নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে অক্ষম।

পদ্ধতি ঃ তুলনামূলক রাজনীতি শব্দবন্ধটিতে 'রাজনীতি' যদি জটিলতার সৃষ্টি করে, তাহলে 'তুলনামূলক' শব্দটিও সমস্যামুক্ত নয়। ওয়েবস্টারের মতে, তুলনা সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রকাশ করার এক 'পদ্ধতি'। প্রাথমিক পর্যায়ে এই অর্থকে যথাযথ মনে হয়। তবুও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সর্বদা এই বিষয়ে একমত নন। আরেন্ড লিজফার্ট 'তুলনামূলক'-কে এক পদ্ধতি হিসাবে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করলেও অন্য অনেকেই তা মেনে নিতে রাজী নন। এস এন এইসেনস্ট্যাডট যেমন বলেন যে, এই শব্দটি "যথাযথভাবে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে নির্দেশ করে না ..... বরং তা বিশেষ গুরুত্ব দেয় সমাজের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় দিকগুলি এবং সামাজিক বিশ্লেষণের উপর।" হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল ও মনে করেন যে এই 'পদ্ধতি'র 'দিকটি তুলনামূলক রাজনীতরি ক্ষেত্রে নতুন কোনো অর্থ বহন করে আনে না। তাঁর

বিশ্বাস, "কেউ যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে বিচার করতে চা , এখন তার কাছে কোনও স্বতন্ত্র তুলনামূলক পদ্ধতির ধারণা অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়, কারণ কোনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্যভাবে তুলনামূলক।"

গ্যাব্রিয়েল আমন্ডের যুক্তি একইরকম। তিনি বলেন ঃ "রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তুলনামূলক রাজনীতির কথা বলা অর্থহীন, কারণ তা যদি বিজ্ঞান হয়, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গি যে তুলনামূলক হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এইসব মতামত আমাদের এক সমস্যাসঙ্কুল জায়গায় এনে ফেলে। তুলনামূলক রাজনীতিতে 'রাজনীতি'-র অর্থ যদি রাজনীতির যে কোনও দিকের অনুসন্ধান হয় ও 'তুলনামূলক' বলেত যদি কোনও বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত চর্চা বোঝায়, তাহলে 'তুলনামূলক রাজনীতি'-র অর্থ কি সহজভাবে 'রাজনীতির বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন' হওয়া উচিত নয় ? তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিতরে ওই নামের স্বতন্ত্র একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ আছে কি ?

আর সাম্প্রতিককালে ফিলিপ সি স্মিটার তুলনামূলক রাজনীতির পদ্ধতির দিকটির এইরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

"পদ্ধতি হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতি এক বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়, যা তত্ত্বের বিকাশ, অনুমিতির পরীক্ষা, কার্যকারণ সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য সামান্যীকরণের ভিত্তি হিসাবে রাজনৈতিক ইউনিট বা এককগুলির সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলিকে কাজে লাগায়। আবার, রাজনীতির যে কোনও ধরনের বিজ্ঞানসম্মত সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলির উপর মনোনিবেশ না করে তা সম্পাদন করা দুরহ।"

তাহলে একথা সম্ভবত স্পষ্ট যে তুলনা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু ল্যাসওয়েল বা আমন্ডের দাবি অনুযায়ী তা কি একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, না কি রাজনীতি অধ্যয়নের অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে একটি ? এছাড়াও এটি যদি এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য বৈজ্ঞানক পদ্ধতিগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য কী ?

আরেন্ড লিজফার্ট ঠিক এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। ল্যাসওয়েল ও আমন্ডের সঙ্গে লিজফার্ট একমত নন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার মৌলিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি একটি। এই ধরনের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি হল পরীক্ষামূলক, সংখ্যাতাত্ত্বিক (statistical) ও নমুনামূলক (case study) পদ্ধতি।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ঃ

সহজভাবে বললে, পরীক্ষামূলক পদ্ধতি দুটি অভিন্ন (identical) বা তুল্যমূল্য ইউনিট বা বর্গ ব্যবহার করে তাদের দুটিকেই একই ধরনের নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় (যেমন কোনও পরীক্ষাগারের অভ্যন্তরে) রাখে এবং তাদের মধ্যে একটির উপর উদ্দীপক (stimulus) প্রভাব সৃষ্টি করে। পরীক্ষার সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরে ওই দুই ইউনিট বা গ্রুপের মধ্যে তুলনা চালায় এবং আগেকার অভিন্ন বা তুল্যমূল্য অবস্থা থেকে কোনও বিচ্যুতি দেখা গেলে এই উদ্দীপক প্রভাবকেই তার কারণ মনে করে।

সারণি ২.১

পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিস্থিতিগত চালনা

(situational manipulation of variables)

	প্রারম্ভিক অবস্থা (original position)	পরীক্ষামূলক উদ্দীপক (experimental stimulus)	পরীক্ষা-উত্তর তুলনা
পরীক্ষামূলক ইউনিট বা গ্রুপ	A	A	$A \sim a = d - x$
কন্ট্রোল ইউনিট বা গ্রুপ	a	—	a

এই পদ্ধতি ধরে নেয় যে, অন্তত দুটি ইউনিট বা গ্রুপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যারা হয় সম্পূর্ণভাবে বা নিদেনপক্ষে সম্ভাব্য সবকটি সম্পর্কিত পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির (অর্থাৎ যারা পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে) প্রসঙ্গে তুল্যমূল্য বা অভিন্ন প্রকৃতির। তুল্যমূল্য হিসাবে পরিগণিত হওয়ার শর্তপূরণ এইসব পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। অন্যথায় সেগুলি পরীক্ষার ফলাফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। (যাদের উপর ভিত্তি করে দুটি গ্রুপের তুল্যমূল্যতা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাদের বলা হয় 'কন্ট্রোল ভেরিয়েবল')। এই তুল্যমূল্যতায় পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয় যদৃচ্ছভাবে বেছে নিয়ে (randomization) বা সাদৃশ্য নির্ণয় করে (matching)। দ্বিতীয়ত, এখানে ধরে নেয়ো হয় যে, পরীক্ষা সংক্রান্ত অবস্থাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোনও গবেষণাগার বা মনঃসমীক্ষকের চেম্বারে এই অবস্থার সৃষ্টি করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, এই পদ্ধতি ধরে নেয় যে পরীক্ষার প্রকৃতি, পর্যায় বা মাত্রা ও সময় গবেষক নিজেই নিয়ন্ত্রণ ও নির্ণয় করতে পারেন।

এই অনুমতিগুলি অভ্রান্ত হলে, কার্য-কারণ (cause and effect) সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিই সবথেকে কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বেশীরভাগে ক্ষেত্রেই এই অনুমিতিগুলি খেটে যায়, এমনকী জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এগুলি অনেকটাই কাছাকাছি চলে যেতে পারে। সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অবশ্য ব্যবহারিক ও নৈতিক, এই দুই ধরনেরই সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে—যদিও কোনও অপেক্ষাকৃত লঘু ও নিকটবর্তী বিকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি ঃ পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি পরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজন বহু সংখ্যক ঘটনার নজিরের, যাতে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির প্রাসঙ্গিক বিচারে তাদের আপেক্ষিক ভিন্নতাকে পরিসংখ্যানের আশ্রয় নিয়ে সনাক্ত করা যেতে পারে। পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির অনুমিত সম্পর্ককে খন্ডিত আন্তঃসম্পর্কগুলির মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। যে পরিবর্তনশীল উপাাদনগুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে, পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তাদের ধারণাগতভাবে (nationally) নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আমার যদি মনে করি শিক্ষা, পেশা ও রাজনৈতিক

আগ্রহ মানুষের ভোট দেবার ইচ্ছা বা আচরণকে প্রভাবিত করে, তাহলে বাকি দুটির প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে তৃতীয়টির প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ, পেশা ও রাজনৈতিক আগ্রহের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ রেখে, মানুষের নির্বাচনী পছন্দকে শিক্ষা কীভাবে প্রভাবিত করে তা বের করা যেতে পারে।

সারণি ২.২

পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির ধারণাগত/পরিসংখ্যানগত চালনা

(Conceptual/statistical manipulation of variables)

কারণবাচক/স্বনির্ভর/প্রভাবশালী পরিবর্তনশীল উপাদান		নির্ভরশীল/প্রভাবিত পরিবর্তনশীল উপাদান
	প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্রভাব	সবকটির সম্মিলিত প্রভাব
শিক্ষা	¾ ¾ ®	ভোট দেবার
পেশা	¾ ¾ ®	ইচ্ছা বা আচরণ
রাজনৈতিক আগ্রহ	¾ ¾ ®	

কার্য-কারণ সম্পর্ককে যথাযথভাবে উপস্থাপনার বিষয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিকে বহু ক্ষেত্রেই এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য বিকৃতিসাধনকারী উপাদানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতিগত বা 'বস্তুগত' (physical), কিন্তু পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে তা শুধুমাত্র ধারণাগত। কাজেই, পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চয়তার মাত্রা অনেক বেশি।

তুলনামূলক পদ্ধতি ঃ এদের থেকে স্বতন্ত্র এক পদ্ধতি হিসাবে লিজফার্ট তুলনামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সূত্র উপস্থাপিত করেন। অধ্যয়নের অন্যান্য শাখাগুলির মতই তুলনামূলক রাজনীতি যতদূর সাধ্য পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে এবং তা করেও থাকে ও আরও বিস্তৃতভাবে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করে। সার্বিক অর্থে ধরলে লিজফার্ট তুলনামূলক পদ্ধতিকে তৃতীয় বিকল্প আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যয়নে তা বিশেষভাবে উপযোগী।

যদি তুলনার ইউনিটগুলির বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিসমূহ বা বিশেষ একটি দেশের ভিতরের ছোট ছোট ভৌগোলিক সত্তাগুলি (যেমন নির্বাচনকেন্দ্র, জেলা ইত্যাদি) হয়, তাহলে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশ্য তূলনামূলক রাজনীতির যেহেতু প্রবণতা রয়েছে সংগ্র ব্যবস্থা বা জাতি-রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার, যেহেতু সবকটি জাতি-রাষ্ট্র, এমনকী একত্রে অনেকগুলির ও তুলনা করা সাধারণত খুব একটা সহায়ক হয় না। পরিসংখ্যানগতভাবে তা সম্ভবপর হলেও বাস্তবে গুরুত্বহীন, কারণ জাতি-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শৃঙ্খলাহীন বৈসাদৃশ্য থাকায় কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। লিজফার্টের মতে, সংখ্যায় অল্প হলেও তুলনামূলক পদ্ধতি 'তুলনাযোগ্য' ঘটনাগুলির তুলনা

করতে সক্ষম। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির মতো তুলনামূলক পদ্ধতিও বিকৃতিসাধনে সক্ষম পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিকে বাদ দিয়ে বা নিয়ন্ত্রণে রেখে কিছু নির্বাচিত উপাদানগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক পীরক্ষার চেষ্টা করে। তুলনামূলক পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পাদন করা হয় অতি যত্নের সঙ্গে তুলনা করার ইউ নটগুলি (যেমন জাতি-রাষ্ট্র) বাছাই করে। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে এই বাছাই করার পদ্ধতি স্থির করা হয় (এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে)।

লিজফার্ট অবশ্য 'বৈসাদৃশ্য'-এর থেকে 'সাদৃশ্য'-কেই বেশি গুরুত্ব দেন এবং সেই অনুযায়ী তুলনামূলক পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেন "পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি যে যুক্তি অনুসরণ করে, সেই একই যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে পদ্ধতি পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির মধ্যেকার প্রকলপ্তি বা অনুমিত (hypothesized) অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পর্ককে পরীক্ষা করে তাকেই তুলনামূলক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ঘটনা বা দৃষ্টান্তগুলিকে এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে স্বনির্ভর উপাদানগুলির বৈসাদৃশ্য সব থেকে বেশি ও 'কন্ট্রোল ভেরিয়েবল' গুলির বৈসাদৃশ্য সব থেকে কম হয়।"

এই দুই পদ্ধতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল তুলনার আওতায় আনা ঘটনা বা দৃষ্টান্তের সংখ্যা ঃ পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে সংখ্যাটা প্রচুর, তুলনামূলক পদ্ধতিতে অল্প।

নীল স্মেলসার এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করেন যখন তিন বলেন যে, তুলনামূলক পদ্ধতিকে "এমন সব তথ্য বা উপাত্ত (data) নিয়ে কাজ করতে হয় যেগুলিকে পরীক্ষাভি কভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং ঘটনা বা দৃষ্ঠান্তের সংখ্যাও এত ক যে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণও সম্ভব হয়ে ওঠে না।" ই ই ইভান্স-প্রিচার্ড-ও এই সূত্রটি মেনে নেন যখন তিনি "ছোট মাপের তুলনামূলক চর্চা" ও "বড় মাপের পরিসংখ্যানমূলক চর্চা"-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁর কাছে "ছোট মাপ"-এর অর্থ নিশ্চিভাবেই ঘটনা বা দৃষ্টান্তের সংখ্যাল্পতা, কারণ অন্য দিক থেকে দেখলে তুলনামূলক গবেষণা যথেষ্ট বৃহদাকারও হওয়া সম্ভব—যেমন উৎপাদন পদ্ধতি সমর্কে মার্কসের তুলনামূলক আলোচনা অথবা ধর্ম ও অর্থনীতির চরিত্রের সম্পর্ক বিষয়ে ওয়েবার-এর তুলনামূলক গবেষণা।

তুলনামূলক পদ্ধতিকে এইভাবে উপস্থাপিত করে লিজফার্ট একে ল্যাসওয়েল বা আমন্ডের দৃষ্টিভঙ্গির অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত করেছেন। লিজফার্টের কাছে এটা কোনও বিষয়কে দেখার শুধু একটি পরিপ্রেক্ষিত নয় অথবা সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সমার্থক বা পরিমাপের এক পদ্ধতি নয়। এক স্বতন্ত্র প্রণালী হিসাবে তুলনামূলক পদ্ধতির অর্থ অল্পসংখ্যক নির্বাচিত ঘটনা বা দৃষ্টান্তের নিবিড় বিশ্লেষণ। অনেকগুলি ঘটনা বা দৃষ্টান্তের অগভীর চর্চার থেকে তা নিশ্চিতভাবে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। নিবিড় বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ইতিহাস ও সংস্কৃতির মতো প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলির উপর মনোযোগ আকর্ষণ করতেও সহায়তা করে। মার্কস, টকুবিল বা ওয়েবারের মত সনাতনী তুলনাবাদী ছাড়াও আধুনিক যুগের ব্যারিংটন মুরের Social Origins of Dictatorship and Democracy, রেইনহার্ড বেনডিক্সের Nation-Building and Citizenship, Work and Authority in Industry ও Kings or People : Power and the Mandate to Rule এবং থেজা স্কোপোলের States and Social Revolutions ইত্যাদি রচনাগুলি অল্পসংখ্যক ঘটনার নিবিড় বিশ্লেষণের উপযোগিতাকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছে। প্রকৃতপক্ষে বহু

সংখ্যক ঘটনার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয় যে সব তুলনামূলক গবেষণা, তাদের থেকে উপরে উল্লিখিত রচনাগুলির প্রভাব আরও অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী।

তুলনামূলক পদ্ধতির আর একটি বিশেষ গুণ হল এই যে, অল্পসংখ্যাক ঘটনা নিয়ে কাজ করার দরুন তথ্যের বৈধত্য বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গবেষককে বেশী দুশ্চিন্তা করতে হয় না। কারণ সংজ্ঞাই বলে দিচ্ছে যে, গবেষকের তথ্য ব্যবহার একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ (কারণ এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনেক নিবিড়)। এছাড়াও এমন কোনোও তথ্যের উপর গবেষককে নির্ভর করতে হয়না যেগুলি তিনি নিজে সংগ্রহ করতে পারেন না বা তাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন না।

তৃতীয়ত, অনেকগুলি পরিবর্তনশীল উপাদান নিয়ে শুরু করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বা অন্য কোনও কলাকৌশলের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা না কমিয়ে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগকারীরা অনুসন্ধানের জন্য অল্প কয়েকটি "গুরুত্বপূর্ণ" উপাদান বেছে নিতে পারেন। বিশ্লেষণের জন্য এদের "গুরত্বপূর্ণ" ভূমিকাকে তিনি যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও তাদের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন। যেমন ফরাসী, রুশ ও চীনা বিপ্লবের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে গয়ে থেটা স্কোপোল এগুলিকে "একটিই সংহত সামাজিক বিপ্লবের নকশার তিনটি তুলনাযোগ্য দৃষ্টান্ত" হিসাবে দেখেছেন এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল উপাদান অর্থাৎ "বুরবন (Bourbon) জার (Tsarist) ও ইমপিরিয়াল ওল্ড (Imperial Old) আমলের রাষ্ট্র, শ্রেণি কাঠামো ও আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি"-র উপর মনোনিবেশ করে সেই সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

কেস স্টাডি (Case Study) পদ্ধতি ঃ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে এখন কেস স্টাডি পদ্ধতি বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক। কেস স্টাডির অর্থ বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বে যে রচনাগুলির কথা উল্লেখ করেছি (পৃষ্ঠা), সেগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে তথাকথিত তুলনাবাদীরা তাদের বাছাই করা এক একটি দেশ (বা ঘটনা ?) নিয়ে অনেক গবেষণা চালিয়েছেন ও সেই সব রচনাগুলি প্রকাশকেরা তুলনামূলক রাজনীতির শ্রেণিভুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। এই রচনাগুলিকে সঠিক অর্থে তুলনামূলক আখ্যা দেওয়া সঙ্গাত কি ?

আগে (প্রথম পরিচ্ছেদে) আমরা আকৃতিগত অনুসন্ধানের সঙ্গে তুলনামূলক কাজের বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছি এবং দেখিয়েছে যে আকৃতিগত অনুসন্ধান "পরীক্ষামূলক" নয়। আকৃতিগত আলোচনার ক্ষেত্রে গবেষক একটি ইউনিটের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন—সেই ইউনিটটি একটি জাতি-রাষ্ট্র, একটি রাজনৈতিক দল, একটি ট্রেড ইউনিয়ন বা কোনও এক যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গাও হতে পারে। একে তুলনামূলক অনুশীলন বলা ঠিক হবে না। কেস স্টাডির প্রসঙ্গেও আমরা কি একই কথা মনে করি ? না কি প্রথামাফিক আকৃতিগত অনুশীলন থেকে পৃথক কেস স্টাডিকে দেখা সম্ভব ? দৃষ্টান্তস্বরূপ, রজনী কোঠারির Politics in India গ্রন্থটিকে আমরা কী আখ্যা দেব—আকৃতিগত আলোচনা, না কি কেস স্টাডি ? কেস স্টাডির কি সত্যিই কোন 'তুলনামূলক' নিহিতার্থ আছে ?

যে আকৃতিগত আলোচনা শুরু এবং শেষ হয় কোনও একটি ইউনিট সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, তাকে

সচরাচর কোনও বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সামান্যীকরণের লক্ষ্যে কাজ করার হেতু বিজ্ঞান কোনও বিশেষ বা নির্দিষ্টের জ্ঞানে তেমন আগ্রহী নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কেস স্টাডি-র অবস্থান কিছুটা দ্ব্যর্থবোধক। কারণ 'কেস' শব্দটির অর্থ সাধারণ কোন বস্তুর নির্দিষ্ট উদাহরণ। 'কেস' স্বাবলম্বী নয়, এক অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। চিকিৎসক যখন রুগীকে 'টাইফয়েডের কেস' বলে চিহ্নিত করেন, তখন তাঁর মনে টাইফয়েডের সাধারণ ধারণাটি ছাপ ফেলে এবং তিনি রুগীকে ওই সাধারণ অসুস্থতাসূচক সূচিত করে। কেস স্টাডি সামান্যীকরণের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, আকৃতিগত আলোচনা তা করতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে লিজফার্ট ছয় ধরনের কেস স্টাডি-র কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) অ-তাত্ত্বিক কেস স্টাডি (Atheoretical case study)

(২) ব্যাখ্যামূলক কেস স্টাডি (Interpretative case study)

(৩) প্রকল্প-সৃষ্টিকারী কেস স্টাডি (Hypothesis-generating case study)

(৪) তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাকারী কেস স্টাডি (Theory-confirming case study)

(৫) তত্ত্ব-দুর্বলকারী কেস স্টাডি (Theory-infirming case study)

(৬) ব্যতিক্রমী কেস স্টাডি (Deviant case study)

কেস স্টাডি সম্পর্কে আমরা উপরে যা বলেছি, সেই অনুসারে অ-তাত্ত্বিক ও ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধানের কেস স্টাডি আখ্যা দেওয়া উচিত হবে না, কারণ কোনও রকম তাত্তিবক বা সামান্যীকরণের উদ্দেশ্যে ছাড়া এদের কাজ কোনও একটি ইউনিটকে মূলত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা। এরা সনাতনী ধাঁচের আকৃতিগত আলোচনা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবু জাতি-রাষ্ট্র বা ট্রেড ইউনিয়ন, যাই হোক না কেন, কোনও একটি ইউনিট সম্পর্কে প্রচুর তথ্য যোগান দিয়ে এরা এক প্রয়োজনীয় কাজ করে। রাজনৈতিক প্রথার বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের মূল্যবান তথ্য সরবারহ করা ছাড়াও পরবর্ত পর্যায়ে ত গঠনের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক আলোচনা এই সঞ্চয় যথেষ্ট সহা ক হতে পারে। এছাড়াও আমরা যদি মেনে নিই যে, বা কোনও সাধারণ ধারণার প্রসঙ্গ ছাড়া কোনও বর্ণনা সম্ভবপর নয়, তাহলে যত অস্পষ্টই হোক না কেন, তথাকথিত অ-তাি ক গবেষণার ভিতরেও তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ব্যাখ্যামূলক আলে চনায় এ কথা আরও বেশী করে প্রযোজ্য, কারণ শুধুমাত্র কেউ যদি সুস্পষ্ট করে তুলতে চান, তাহলে একই বা ভিন্ন ধরনের আলোচনার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখানো ছাড়া উপায় নেই।

কেস স্টাডির পরের চারটি ধরন স্পষ্টতই তাত্ত্বিক উপলব্ধি বা তত্ত্ব গঠনের সঙ্গে যুক্ত। প্রকল্প সৃষ্টিকারী কেস স্টাডির ক্ষেত্রে গবেষক কোনও নির্দিষ্ট ইউনিটের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করলেও তাঁর লক্ষ্য থাকে অন্তত একটি বা একাধিক সাধারণ প্রস্তাব বা প্রকল্প উপস্থাপিত করার দিকে। পরবর্তী পর্যায়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তা কাজে লাগে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লয়েড ও সুশান রুডল্ফ নির্দিষ্ট একি দেশ, এক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণের সম্পর্কের বিষয়ে একটি প্রকল্প গঠন করেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী, বিপরীতধর্মী হওয়া দূরের কথা, এরা প্রকৃতপক্ষে "পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেও পরস্পরের রূপান্তর ঘটায়" (Modernity of Traditions : Political Development in India)।

তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাকারী বা তত্ত্ব-দূর্বলকারী কেস স্টাডির মর্ম প্রচলতি তত্ত্বকে শক্তিশালী করে তুলতে বা তাকে চ্যালেঞ্জ করতে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোর অভ্যন্তরে কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। এটা হতে পারে যে ওই একটি মাত্র ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান কোনো ক্ষেত্রেই তেমন উপযোগী হল না। তবুও কখনও কখনও কোনো 'গুরুতর' ('Critical') বিষয় সম্পর্কে এ এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। এমনই এক কেস স্টাডি হল স্যামুয়েল বিয়ার-এর British Politics in the Collectivist Age, যেখানে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অ-বৈপ্লবিক যাত্রাকে মসৃণ করে তুলতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক কৃষ্টির ভূমিকার উপর আলোকপাত করে তিনি গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক কৃষ্টির সম্পর্ককে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ধরনের কেস স্টাডির আরও সাম্প্রতিক এক দৃষ্টান্ত হলো ফ্র্যাঙ্কলিন ও বউন সম্পাদিত Political Culture and Cosntitutionalism। এই গ্রন্থে দশটি দেশ সম্পর্কে দশজন পৃথক বিশেষজ্ঞ তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিয়মতান্ত্রিকতাকে (constitutionalism) নির্ভরশীল ও রাজনৈতিক কৃষ্টিকে স্বনির্ভর হিসাবে বিবেচনা করেছেন। নিজের নিজের আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে এই পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির সম্পর্ক খুঁজলেও, এক দেশের উপাদানগুলির সঙ্গে অন্য দেশের উপাদানগুলির তুলনা করার কোনো প্রয়াস করা হয়নি। কাজেই এই গ্রন্থটির তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য থাকলেও তা কেস স্টাডির এক সংকলনই রয়ে গেছে।

সবশেষে, ব্যতিক্রমী কেস স্টাডির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো এমন এক ঘটনা বা দৃষ্টান্ত, যা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট পরিস্থিতির অধীনে থাকার দরুন প্রচলিত তত্ত্ব থেকে দূরে সরে যায়। কোনও তত্ত্ব বা সামান্যীকরণের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করতে বা তাদের মধ্যে এখন অনুপস্থিত আরও কিছু পরিবর্তনশীল উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিতে এই ধরনের কেস স্টাডি অত্যন্ত উপযোগী। ব্যতিক্রমী কেস স্টাডির সবথেকে উৎকৃষ্ট উদাহারম সম্ভবত লিপসেট, কোলম্যান ও ট্রাউ-এর Union Democracy। এই গ্রন্থে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল টাইপোগ্রাফারস ইউনিয়নকে এমন এক সংগঠন হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন যা "গোষ্ঠীশাসনের লৌহ আইন" ("Iron law of oligarchy") সম্পর্কে রবার্ট মিশেলল-এর বিখ্যাত গবেষণাপত্রকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে।

ব্যতিক্রমী কেস স্টাডির আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল ১৯১৭ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত হল্যান্ডের রাজনীতি সম্পর্কে লিজফার্টের নিজস্ব গবেষণা যেখানে যথেষ্ট মাত্রায় সামাজিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও (যা গণতন্ত্রের অনুকূল নয়) এক সফল, কার্যকর গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল (Politics of Accomodation)। হল্যান্ডের এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে লিজফার্ট গণতন্ত্রের এক সৌহার্দ্যমূলক মডেল (consociational model) গঠন করেন।

লিজফার্ট-কৃত কেস স্টাডির এই শ্রেণিবিভাগকে কোনো আদর্শ পরিস্থিতিতে কেস স্টাডি বলা চলে, কারণ বাস্তবে এদের মধ্যে সমাপতন (overlapping) ঘটে। যেমন, রজনী কোঠারির Politics in India গ্রন্থটিতে তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাকারী (যেহেতু তিনি ভারতের বিষয়ে কাঠামোগত-ক্রিয়াসংক্রান্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন) ও প্রকল্প সৃষ্টিকারী (যত দূর পর্যন্ত তিনি কেন্দ্র-প্রান্ত মডেল অনুসরণের কথা বলছিলেন), এই

ধরনের কেস স্টাডি বলা যেতে পারে। এই ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে প্রকল্প সৃষ্টিকারী ও ব্যতিক্রমী ধরনগুলি তত্ত্বের ক্ষেত্রে সব থেকে মূল্যবান অবদান রাখে বলে লিজফার্ট মনে করেন।

কেস স্টাডি পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট বিশদভাবে আলোচনা করলাম কারণ আধুনিক তুলনাবাদীরা আকৃতিগত আলোচনাকে বর্জন করলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কোনও একটি দেশ বা ইউনিট সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে এখনও প্রচন্ড উৎসাহী। নির্বাহযোগ্যতার (manageability) বিচারে এটি অবশ্যই এক বাস্তবমুখী নির্বাচন। অন্যথায়ও এতে তেমন কোন ত্রুটি নেই, অবশ্যই যদি আমরা একক ইউনিটের অনুসন্ধানকে আকৃতিগত আলোচনায় পরিণত না করে 'কেস স্টাডি'-র কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি।

২.৪ তুলনার কৌশল (Strategies of comparison)

নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা কি উচিত ? নামের যথার্থতা অনুসরণ করে তুলনামূলক রাজনীতির অর্থ কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর ভিত্তি করে একাধিক ইউনিটের (জাতি-রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) তুলনা করা। এই বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলির বর্ণনা ছাড়াও তুলনাবাদীদের উদ্দেশ্য তাদের নির্বাচিত ইউনিটগুলির মধ্যে এদের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। তিনি জানতে চান এই বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলির ফলে আলোচ্য ইউনিটগুলি পরিবর্তিত হয় কি না, এবং হলে তা কীভাবে হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান বা এই বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলির আচরণের ধারা সম্পর্কে কোনও সামান্যীকরণের সূত্র গঠন করতে চান, যেগুলিকে ইউনিটগুলির বাইরেও প্রয়োগ করা সম্ভব। নীচের সারণির সাহায্যে এটা দেখানো যেতে পারে।

সারণি ২.৩

তুলনার সরল মেট্রিক্স (Simple matrix for comparison)

ইউনিট

বৈশিষ্ট্য/পরিবর্তনশীল উপাদান	U1	U2	U3	Un
C_1				
C_2				
C_3				
C_n				

C_1, C_2, C_3, C_n বৈশিষ্টগুলিকে বর্ণনা করতে হবে এবং U_1, U_2, U_3, U_n ইউনিটগুলির জন্য তাদের আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে হবে। একইভাবে C_1 থেকে C_n বৈশিষ্ট্যগুলির আচরণের পটভূমিতে ইউনিটগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্তনকে ভিত্তি করেই ইউনিটগুলিকে বুঝে ওঠা সম্ভব হবে এবং দ্বিতীয়ত এই ইউনিটগুলির বাইরেও সামান্যীকরণ করা যাবে।

কয়েকজন গবেষক (যেমন The logic of Comparative Social Inquiry গ্রন্থে অ্যাডাম প্রেওরস্কি ও হেনরী টিউন) ইউনিটগুলির নামবাচক বিশেষ্য (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ভারত ইত্যাদি) পরিহার করে সেই জায়গায় তাদের অবস্থা চিহ্নিত করতে সক্ষম এমন সব পরিবর্তনশীল উপাদান ব্যবহারের সুপারিশ করে সামান্যীকরণের আরও সাহসী এক উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ইত্যাদির কথা না বলে আমরা উন্নত/উন্নতিশীল ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক/অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলতে পারি। এ ক্ষেত্রে 'উন্নত' বা 'গণতান্ত্রিক' শ্রেণিভুক্ত দেশগুলি সম্পর্কে তথ্য যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিশে জড়িয়ে যেতে পারে, এই একই ঘটনা তেমন ভাবে ঘটতে পারে 'উন্নতিশীল' বা 'অগণতান্ত্রিক' দেশগুলির বেলাতেও। এর ফলে প্রত্যেকটি ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলির আচরণ ও আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়াতে স্বতন্ত্রভাবে ইউনিটগুলির মাধ্যমে না এগিয়ে এই ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সোজাসুজি সামান্যীকরণ করা সম্ভব হয়। তখন মেট্রিক্সের চেহারা হয় এইরকম ঃ

সারণি ২.৪

স্থান/কালের প্রসঙ্গহীন তুলনা (Comparison without reference of time/place)

ইউনিট/ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য/পরিবর্তনশীল উপাদান	বৈশিষ্ট্য	গণতান্ত্রিক	অগণতান্ত্রিক
C_1			
C_2			
C_3			
C_n			

এর অর্থ আমরা এই দুটি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সামান্যীকৃত বক্তব্য পেশ করতে পারি ঃ

কৌশল ১ : যদি AB ইউনিটগুলির বৈশিষ্ট্য হয় XY ও AB ইউনিটগুলি গণতান্ত্রিক হয়, তাহলে XY-কে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

কৌশল ২ : XY বৈশিষ্ট্যগুলি যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হয় ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত না হয়, তাহলে XY-কে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

নির্দিষ্ট ইউনিট বা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রজুড়ে সামান্যীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু এটি আবার আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলি যে ইউনিটগুলির ক্রিয়াশীল, তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকে উপেক্ষা করে। কারণ দুটি 'গণতান্ত্রিক' দেশ একই সময়ে আরও অনেক কিছু হতে পারে এবং সেই সব ক্ষেত্রে তারা পরিচিত ও অপরিচিত, উভয় দিক দিয়েই আলাদা রকমের হতে পারে। তাদের গায়ে একই ছাপ মেরে তাদের অন্যান্য সদৃশ ও বিসদৃশ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অবিচার করা

হতে পারে। তাদের গায়ে একই ছাপ মেরে তাদের অন্যান্য সদৃশ ও বিসদৃশ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অবিচার করা হতে পারে। ইউনিটগুলি, বিশেষত জাতি-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্ন তা যেহেতু প্রবল ও সমাজ বিজ্ঞানীরা যেহেতু এই ভিন্নতার উপর প্রচন্ড গুরুত্ব আরোপ করেন, তুলনাবাদীরা সেই কারণে সচরাচর খুব সাহসী কোন সামান্যীকরণের পথে এগোন না। বাস্তবে এই ধরনের সামান্যীকরণ খুবই বিমূর্ত চরিত্রের হয়ে উঠতে পারে, যা ইউনিটগুলির প্রকৃতি চরিত্র থেকে অনেকটা দূরবর্তী এবং ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। সেই কারণেই স্থান ও কালের প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তুলনাবাদীরা এর ফলে প্রথম কৌশলটি গ্রহণ করতে পছন্দ করেন।

সিডনী ভার্বা, নর্ম্যান নাই ও জো-অন-কিম Participation and Political Equality (১৯৭৮) শীর্ষক সাত-দেশীয় তুলনামূলক গ্রন্থটিতে ঠিক সেটিই করেছেন। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ রাজনীতিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে, একথা ধরে নিয়ে লেখকরা সাতটি দেশে, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, নাইজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও নেদারল্যান্ডসে কী কী কারণে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ মসৃণ করে তোলে সেগুলি খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা শুরু করেছেন এবং 'সর্ব-সাংস্কৃতিক সামান্যীকরণ' ('pan-cultural generalization) দিয়ে, যার মতে সব কিছু যদি সমান হয়, তাহলে অংশগ্রহণের জন্য যে ব্যক্তির বেশি সংস্থান আছে ও বেশি প্রণোদনা (motivation) আছে, তিনিই বেশি করে অংশগ্রহণ করবেন। সংস্থান ও প্রণোদনা মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং এই দেশগুলির প্রত্যেকটিতেই ব্যক্তি-নাগরিকদের মধ্যে কমবেশি পরিমাণে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। কিন্তু এই দেশগুলিতে বাকি সব কিছু সমান নয়। এই সব দেশগুলিতে জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, অঞ্চল, লিঙ্গ ইত্যাদি বিভাজনের ভিন্ন ভিন্ন নকশা সৃষ্টি করে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের মত প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে এই বিভাজনগুলিকে সংগঠিত করে—সেই বিষয়গুলিতেও এদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই এই সব ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলিতে একই রকম সংস্থান ও প্রণোদনা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের এই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও হার লক্ষ্য করা যায় ও অংশগ্রহণের এই ভিন্নতাকে লেখকেরা বিভাজনের নানারকম নকশা ও এই বিভাজনগুলিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। নমুনা হিসাবে এক একজন উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভরশীল এই পরিমাণগত তুলনামূলক সমীক্ষা বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি অনুসারে চালানো হয়ে থাকে। কাজেই, সবকটি দেশকে একই গোত্রের মধ্যে না ফেলে, প্রতিটি অধ্যায় এই সাতটি দেশের প্রত্যেকটিতে কিছু বৈশিষ্ট্য/পরিবর্তনশীল উপাদান ও তাদের আন্তঃ সম্পর্কের বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে। অর্থাৎ, নির্বাচিত বৈশিষ্ট্য/পরিবর্তনশীল উপাদান অনুসারে সাতটি দেশকে পাশাপাশি স্থাপিত করা হয় এবং একই সময়ে তাদের তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে লেখকরা নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে অধিক মনোযোগ দিতে সক্ষম হন।

মূলত সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বহু-দেশীয় তুলনার আর একটি উদাহরণ হলো চার্লস, লুই ও রিচার্ড ট্রিলির The Rebellious Century : 1830-1930 শীর্ষক ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটি। এখানে ট্রিলি ত্রয়ী যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হল ঃ নাগরিক, শিল্পোন্নত জীবন ধারার

উত্থান সমষ্টিগত আচরণ, বিশেষ হিংসাত্মক কার্যকলাপের উপর কি কোনও প্রভাব ফেলতে সক্ষম? 'তুলনামূলক' পন্থায় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে ও তার উত্তর পেতে তাঁরা একই সময় জুড়ে তিনটি দেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এই দেশগুলি হল ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালী। ভার্বা ইত্যাদির পথ অনুসরণ না করে ট্রিলিরা অধ্যায়গুলিকে সাজিয়েছেন দেশ অনুসারে, বৈশিষ্ট্য অনুসারে নয়। 'তুলনা' বিষয়ক শেষ অধ্যায়টিতে তাঁরা প্রত্যেকটি দেশের নির্দিষ্ট তথ্যগুলি একত্রিত করে তাদের সাদৃশ্য ঔ বৈশাদৃশ্যগুলি আমাদের নজরে এনেছেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সামান্যীকরণে আগ্রহী হলেও এই দুটি গ্রন্থের কোনোটিই নামবাচক বিশেষ্য (যেমন দেশের নাম) অথবা স্থান ও কালের পটভূমিকে পরিত্যাগ করেনি বা সাধারণ অথবা সার্বিক (nomothetic) বক্তব্য পেশ করা থেকে বিরত থাকেনি। উপাদানগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অধ্যায়যুক্ত করলেও, দুটি গ্রন্থই ইউনিট অনুসারে বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধানের নকশাটি অনুসরণ করেছে (কৌশল ২)।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলির তুলনা ঃ কোনোরকম তুলনার কাজে নামার আগেই আমাদের সার একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় : আমাদের কী ধরনের বস্তুর তুলনা করা উচিত—সদৃশ না বিসদৃশ? এক দিক থেকে বিচার করলে প্রশ্নটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, কারণ যে কোনো দুটি বস্তুরই কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য থাকা সম্ভব। এ কথা যে কোনও দুটি ফল, পশু বা মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবুও আমাদের আপেলের সঙ্গে আপেলের তুলনা করা উচিত না কি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করা উচিত—এই প্রশ্নটি বাস্তবে এতটা অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ, সদৃশ বা বিসদৃশ—যে বস্তুগুলিরই আমরা তুলনা করি না কেন, তা আমাদের গৃহীত পদ্ধতি, আমাদের উত্থাপিত করা প্রশ্ন বা আমাদরে পনীত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। আমরা আগেই বলেছি যে সমাজবিজ্ঞানের তুলনাবাদী গবেষকরা পরীক্ষাগারের পরিবেশের সুবিধা উপভোগ করতে পারেন না। তবুও কুশলী পন্থায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলিকে ব্যবহার করে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী ও শক্তিশালী ভিত্তি গঠন করতে সক্ষম হন।

সনাতনপন্থী সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডার্কহেইম যেমন আত্মহত্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী (ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট, বিবাহিত ও অবিবাহিত, লাটিন ও স্যাক্সন ইত্যাদি) নিয়ে পরীক্ষা চালান এবং লক্ষ্য করেন যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আত্মহত্যার হার পরিবর্তিত হয় তাদের সামাজিক সংহতির মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। অন্যথায় বিসদৃশ এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আত্মহত্যার হার ও সামাজিক সংহতির মাত্রার এই যোগাযোগ প্রকাশের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যাখ্যাটির উৎকর্ষ।

অন্য দিকে ম্যাক্স ওয়েবার পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের উত্থান সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় সদৃশ ঘটনাগুলির তুলনার আশ্রয় নিয়েছেন। আধুনিক পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদ যে সব পরিস্থিতিতে বিকাশ লাভ করে, সেগুলিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু ঘটনার তুলনা করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন যেখানে, ট্যালকট পারসনসের মতে, "বস্তুগত কারণগুলির অবস্থা ও তাদের বিকাশের সম্ভাব্য স্বনির্ভর প্রবণতাগুলি প্রাসঙ্গিক বিচারে মূলত একই রকমের।" চীন, ভারত ও পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে গবেষণা প্রসঙ্গে তিনি "উৎপাদনের পরিবেশ", ধনতান্ত্রিক প্রগতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা বা অসুবিধার পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার ফল হলো এই সিদ্ধান্তটি যে এই তিনটি

পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে এবং সুবিচার পাল্লাটি ভারত ও চীনের দিকেই ভারী।" বস্তুগত পরিস্থিতির এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ওয়েবার মনে করেন যে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মের জন্মস্থান পশ্চিম ইউরোপেই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের সূত্র গঠন করতে গিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল তুলনার মৌলিক পদ্ধতি হিসাবে 'মিল' (agreement) ও 'অমিল' (difference) পদ্ধতির সুপারিশ করেন, যাদের মাধ্যমে কার্য-কারণ সূত্রটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আধুনিক তুলনামূলক রাজনৈতিক "সবথেকে সদৃশ ব্যবস্থা" ও "সবথেকে বিসদৃশ ব্যবস্থা" কৌশলগুলি মিলের করা ভেদাভেদের ভিত্তির উপরেই গঠিত হয়েছে, যদিও আধুনিক তুলনাবাদীরা মিলের পরিভাষাগুলিকে বর্জন করেছেন।

"সবথেকে সদৃশ ব্যবস্থা" কৌশলটি আন্তঃ ব্যবস্থা সাদৃশ্যগুলিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করে সেগুলিকে তখন 'নিয়ন্ত্রণাধীন' বলে গণ্য করা হয় এবং অল্প কয়েকটি আন্তঃব্যবস্থা বৈসাদৃশ্যগুলির উপর গুরুত্ব দেয়, যেগুলিকে নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির ব্যাখ্যামূলক কারণ হিসাবে দেখা হয়। সাদৃশ্যকে সর্বোচ্চ ও বৈসাদৃশ্যকে সর্বনিম্ন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার নীতির ভিত্তিতেই তুলনার জন্য ঘটনাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। দুটি ইউনিটের পার্থক্যের জন্য যেহেতু সদৃশ পরিস্থিতিগুলিকে দায়ী করা যায় না, সেই কারণে তাদের পরিবর্তনীয় (ফলে নিয়ন্ত্রণাধীন) মনে করা হয় ও বিশ্লেষণের বাইরে রাখা হয়।

একটা সহজ দৃষ্টান্তের কথা ধরা যাক। দুটি দরিদ্র দেশের একটিতে যদি গণতন্ত্র ও অপরটিতে সামরিক শাসন বজায় থাকে, তাহলে গণতন্ত্র বা সামরিক শাসন কোনোটই দারিদ্র্যের সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কোনো অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতে গিয়ে চিকিৎসকও একই ধরনের 'সাদৃশ্যগুলিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার' পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল উপাদান বেছে নিয়ে সেগুলি পরীক্ষার নির্দেশ দেন। যেগুলি 'স্বাভাবিক' অবস্থায় আছে দেখা যায়, রোগের সম্ভাব্য কারণের তালিকা থেকে সেগুলিকে বাদ দেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র 'অস্বাভাবিক' উপাদানগুলিকেই রোগের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে মনে করা হয়। এখানে 'স্বাভাবিক' বলতে বোঝায় যা বেশীরভাগ নীরোগ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে যদি কোনও জিনিষ "স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ এমন অবস্থায় থাকে যে তা অন্যের ভিতরে একই রোগের জন্ম দিতে অক্ষম হয়, তাহলে বর্তমান দৃষ্টান্তটিতে রোগের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না।

আফ্রিকার উপজাতি নিয়ে গবেষণার সময় এস এফ নাদেল নিউপ ও গোয়ারি (Gwari) নামে দুটি আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিতন হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে পরিবেশ, আত্মীয়তা, ভাষা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও ডাকিনীবিদ্যা (witchcraft) সংক্রান্ত ধারণায় তারা ভিন্নমত। নিউপে ডাকিনীরা সর্বদাই নারী, কিন্তু গোয়ারিতে তারা যে কোনো লিঙ্গের হতে পারে। তাদের মধ্যেকার সাদৃশ্যগুলির কোনটির সাহায্যেই এই পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সম্ভাব্য কারণ হিসাবে এগুলি বাদ পড়ায় আরও অল্পসংখ্যক পরিবর্তনশীল উপাদানের উপর মনোনিবেশ করে নাদেল 'সঠিক' ব্যাখ্যাটি খোঁজের চেষ্টা করেছিলেন। (তিনি এই ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েচিলেন এই দুই উপজাতির নারীদের অর্থনৈতিক

মর্যাদার বৈষম্যের মধ্যে: গোয়ারিতে নারীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু নিউপে নারীরা প্রায়শই তাদের স্বামীদের থেকে বেশি সম্পদশালী। কাজেই কর্তৃত্বময়ী স্ত্রীর কাছে অসহায় স্বামী নারীকে ডাকিনী ভাবতেই অভ্যস্ত।)

থেডা স্কোপোলি ও ট্রিলি-রা তুলনার 'সবথেকে সদৃশ ব্যবস্থা' কৌশলটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। 'আঞ্চলিক গবেষণা'-ও (area studies) এই কৌশলের উপর নির্ভরশীল কারণ এটা ধরে নেওয়া হয় যে কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা যায়। 'পশ্চিমী গণতন্ত্র', 'লাতিন আমেরিকার সামরিক শাসন', 'ক্রান্তীয় আফ্রিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থা', 'কমিউনিস্ট ব্যবস্থা', 'শিল্পসমৃদ্ধ দেশ' ইত্যাদি তুলনামূলক গবেষণাগুলির প্রত্যেকটিই 'সর্বাধিক সাদৃশ্য' কৌশলভিত্তিক। যে সাদৃশ্যগুলির উপর জোর দেওয়া হয়, সেগুলিকে সাংস্কৃতিক বা কাঠামোগত বা দুই-ই হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাগুলির তুলনার ক্ষেত্রে একই সাংবিধানিক কাঠামো ও একই ধরনের আইন ব্যবস্থার মতো সাদৃশ্যগুলিরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

এর বিকল্প 'সব থেকে বিসদৃশ ব্যবস্থা' কৌশলটি 'সর্বাধিক বৈসাদৃশ্যের' নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে যেগুলিকে অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা যায়। 'পশ্চিনী গণতন্ত্র', 'লাতিন আমেরিকার সামরিক শাসন', 'ক্রান্তীয় আফ্রিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থা', 'কমিউনিস্ট ব্যবস্থা', 'শিল্পসমৃদ্ধ দেশ' ইত্যাদি তুলনামূলক গবেষণাগুলির প্রত্যেকটিই 'সর্বাধিক সাদৃশ্য' কৌশলভিত্তিক। যে সাদৃশ্যগুলির উপর জোর দেওয়া হয়, সেগুলি সাংস্কৃতিক বা কাঠামোগত বা দুই-ই হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাগুলির তুলনার ক্ষেত্রে একই সাংবিধানিক কাঠামো ও একই ধরনের আইন ব্যবস্থরা মতো সাদৃশ্যগুলিরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

এর বিকল্প 'সব থেকে বিসদৃশ ব্যবস্থা' কৌশলটি 'সর্বাধিক বৈসাদৃশ্যের' নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে, যদি ব্যাপক মাত্রায় পৃথক ব্যবস্থাগুলির ভিতরে দুটি পরিবর্তনশীল উপাদান এক সঙ্গে পরিবর্তন হয়, তাহলে ব্যবস্থার প্রভেদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ও এই ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে, কারণ ব্যবস্থার প্রভেদকে অতিক্রম করে তা কিছু বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। প্রেওরস্কি ও টিউন যেমন দেখিয়েছেন যে, ভারত, আয়ারল্যান্ড, ইরান ও ইটালিতে শিক্ষা যদি আন্তর্জাতিকতাবাদের মনোভাবের সঙ্গে সদর্থকভাবে সম্পর্কিত হয়, তাহলে এই দেশগুলির পার্থক্য আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাবকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই কৌশল অনুসরণ করা তুলনাবাদীর উদ্দেশ্য হল বিসদৃশ ইউনিটগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বা সমতার (analogy) অনুসন্ধান করা। এই সাদৃশ্যগুলিকে এখন জোরালো মনে করা হয় কারণ সেগুলি বহু আন্তঃইউনিট থাকা সত্ত্বেও টিকে থাকার ক্ষমতা রাখে।

এই দুই বিকল্প কৌশলগুলিকে এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

সারণি ২.৫

'সাদৃশ্য' ও 'বৈসাদৃশ্য'-কে সর্বাধিক করে তোলার কৌশল

(Strategies for maximizing 'similarity' and 'difference')

	অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক (constants)	স্বনির্ভর পরিবর্তনশীল উপাদান (independent variables)	নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল উপাদান (dependent variables)
সাদৃশ্যকে সবথেকে বাড়িয়ে তোলা	ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, যেমন ঐতিহ্য, ভূগোল, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর পরি-বর্তনশীল উপাদান	দল ব্যবস্থা, নেতৃত্বের দায়িত্ব স্বনির্ভর ধ্রুবক (independent	গণতান্ত্রিক/সামরিক শাসন নির্ভরশীল ধ্রুবক (dependent constant)
বৈসাদৃশ্যকে বাড়িয়ে তোলা	সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন ভারত, আয়ারল্যান্ড, ইটালি	শিক্ষা	আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাব

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ভার্বা ও অন্যান্যরা, তাঁদের উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বৈসাদৃশ্যের কৌশল ব্যবহার করেছেন। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, নাইজেরিয়া, জাপান, আফ্রিকা, যুগোশ্লাভিয়া ও নেদারল্যান্ডসের মতো এমন কয়েকটি দেশ নিয়েছেন, যারা শুধুমাত্র যে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত তা-ই নয়, কাঠামো ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে মিল অতি সামান্য। আয়তন, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বিকাশ, ধর্ম, ইতিহাস বা ঐতিহ্য—এই সবকটি ক্ষেত্রেই তারা একে অন্যের থেকে পৃথক। লেখকদের অনুসন্ধানের এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, আলোচ্য সবকটি দেশই (তাদের সমীক্ষার পর নাইজেরিয়ার পরিস্থিতি বদলে যায়) আইন প্রণয়ন করে লিঙ্গ, আয়, বৃত্তি, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছিল। লেখকরা জানতে আগ্রহী ছিলেন নাগরিকদের এই অধিকারের প্রয়োগ এক একটি দেশে এক একরকম কিনা এবং তা হয়ে থাকলে এটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই অধিকারকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তাঁরা এই দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু অংশগ্রহণের হার যে ব্যক্তিগত (প্রণোদনা) ও সমাজ সংক্রান্ত (দল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান) বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল, এই দেশগুলির মধ্যে সেই সব ৎেত্রে তাঁরা সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই 'সর্বাধিক বৈসাদৃশ্য' কৌশলটিকে লেখকরা একই সঙ্গে শক্তিশালী ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করতেন। শক্তিশালী, কেননা বিভিন্ন চরিত্রের এইসব দেশগুলিতে ব্যাখ্যামূলক উপাদানগুলির মধ্যে যদি সমরূপতা (uniformity) খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে "এটা বিশ্বাস করার কিছু কারণ জন্মায় যে এই সমরূপতা সর্বত্র

সাধারণভাবে প্রযোজ্য।" কিন্তু এটি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ "তা উপযোগী হয় যদি সবকটি দেশ জুড়েই এই সমরূপতা আবিষ্কার করা যায়। এই ধরনের কোনও সমরূপতা খুঁজে না পাওয়া গেলে কোনো স্পষ্ট ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না।" কারণ সে ক্ষেত্রে, এই দেশগুলি যে যে দিক দিয়ে পৃথক অথবা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তথ্য সংগ্রহের খাতিরে পার্থক্যগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেগুলিকেই সমরূপতার অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

তুলনার এই দুটি কৌশলে পার্থক্য নির্দেশ করার পরে আমাদের এটা উল্লেখ করতে হবে যে, উপরের প্রতিটি আলোচনাতেই আমরা দেখতে চেয়েছি লেখকরা কীভাবে এই কৌশলগুলিতে প্রয়োগ করেছেন, তাঁরা কী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা নয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়টির উপর আমরা গুরুত্ব দিতে চাই, তা হল সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই কৌশলগুলি ব্যবহার করে গবেষকরা রাজনীতি সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মনে রাখা উচিত যে এই দুটি কৌশলের পার্থক্যকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এই আলোচনার শুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, যে কোনও দুটি ঘটনার মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে। কোনও দুটি দেশই সম্পূর্ণ সদৃশ বা সম্পূর্ণ বিসদৃশ নয়। এই একই কথা ব্যক্তি বা মধ্যবর্তী কোনও ইউনিটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা কোনও দুটি ঘটনাকে 'সদৃশ' বা 'বিসদৃশ' মনে করব কিনা তা নির্ভর করে আমরা ঘটনা দুটির কোন বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাসঙ্গিক মনে করতে চাই এবং আমরা কী ধরনের গবেষণামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই সেই বিষয়গুলির উপর। সুতরাং আমরা যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সদৃশ (পশ্চিমী গণতন্ত্র) বা বিসদৃশ (সংসদ ও রাষ্ট্রপতি শাসন সরকার) ব্যবস্থা, দুই-ই মনে করতে পারি।

তুলনার জন্য বিশ্লেষণের স্তর ঃ তুলনামূলক রাজনীতিতে মুখ্য প্রবণতা হল রাষ্ট্র বা সমাজ সংক্রান্ত রাজনীতিকে বিশ্লেষণের মৌলিক ইউনিট হিসাবে দেখা। এমনকি যখন আকৃতিগত গবেষণারই বেশি চল ছিল, তখনও পৃথক পৃথক দেশ বা রাষ্ট্রগুলিকে 'সম্পূর্ণ' বা 'সমগ্র' ধরে নিয়েই অনুসন্ধান চালানো হত। এই প্রবণতা চালু থাকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত, যার পরে তুলনামূলক রাজনীতি আরও বেশি 'তুলনামূলক' হয়ে ওঠে। কাঠামোগত-ব্যবহারিকতাবাদ (structural functionalism) ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মত সামগ্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব সামগ্রিক তুলনাকে (systemic comparison) আরও উৎসাহ যোগায়। সামগ্রিক তাত্ত্বিক কাঠামোগুলির সাহায্যে সামগ্রিক তুলনা যখন আয়ত্তাধীন হয়ে এসে ছ, তখনই আবার এই সামগ্রিক কাঠামোগুলি রাজনীতিকে একটা ছকে এঁকে ফেলেছে, যার ফলে ছাত্ররা রাজনী তর আরও গতিশীল দিকগুলির উপর নজর দিতে অক্ষম হয়।

সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার চর্চা এক দিক থেকে যথেষ্ট উপযোগী, কারণ তা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। যখন আমরা কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানিনা বা অত্যন্ত অল্প জানি, তখন এই ধরনের অধ্যয়ন যথেষ্ট কাজে আসে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে সমগ্র একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ।

সুতরাং এই ধরনের অধ্যয়নের মাধ্যমে যে সব সিদ্ধান্তে বা সামান্যীকরণে পৌঁছনো যায়, সেগুলির ভিত্তি দুর্বল হতে বাধ্য।

এই সব তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমস্যাগুলির জন্য বহু গবেষকই তুলনাবাদীদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশগুলির উপর অথবা রাজনীতির টুকরো টুকরো স্তরগুলির উপর মনোনিবেশ করতে পরামর্শ দেন। জোসেফ লা প্যালোমবারা যেমন বলেন যে, সংগ্র ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে যেসব ফাঁকফোকর আছে, সেগুলি ভরাবার জন্য আমাদের উচিত "রাজনৈতিক ব্যবস্থার খন্ডাংশগুলির দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া, তা সেই খন্ডগুলি প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত বা আচরণ-সংক্রান্ত, যে ধরনেরই হোক না কেন।" দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি আ নসভা, সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক দলগুলির" কথা উল্লেখ করেন।

লা প্যালোমবারার মতে এই ধরনের অনুসন্ধানগুলি আরও বিশদ্ তথ্য উৎপাদন করা ছাড়াও ভবিষ্যতে কম বিমূর্ত প্রকারভেদের (abstract typology) জন্ম দেবে। দ্বিতীয়ত, মাঝারি বিস্তারের (middle-range) প্রস্তাবগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হয়। তৃতীয়ত, এই ধরনের অনুসন্ধান তুলনামূলক রাজনীতিতে নীতি-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কাছাকাছি নিয়ে আসে, লা প্যালোমবারা যেগুলিকে রাজনীতির সারবস্তু আখ্যা দিয়েছেন।

এর থেকে তুলনামূলক রাজনীতির ছাত্রদের কাছে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তুলনা অনেকগুলি স্তরে সম্ভব। সমগ্র ব্যবস্থার স্তরে যেমন তুলনা করা সম্ভব, তা তেমনই সম্ভব প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে, যেমন আইনসভা আমলাতন্ত্র, দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যে। একইভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার স্তরেও তুলনা সম্ভব, যেমন বিভিন্ন স্তরে নীতি নির্ধারণ বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা নির্বাচনী প্রক্রিয়া।

যাইহোক, লা প্যালোমবারা যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, অর্থাৎ এই ধরনের চর্চার আগে থেকে কোনও তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাড় করা তেমন কোনও গুরুতর সমস্যা নয়। কারণ, বিশ্লেষণের ইউনিটের প্রতি আগ্রহই প্রাথমিকভাবে আমাদের গবেষণা নির্ণয় করে। কোনও নির্দিষ্ট স্তরে বিশ্লেষণের ইউনিটটি চিহ্নিত করা হয়ে গেলে তার তাত্ত্বিক অবস্থানটি নির্ণয় করা কোনও অনতিক্রমনীয় সমস্যা নয়।

২.৫ তুলনামূলক গবেষণার নকশা

তুলনার কৌশল ও তুলনার জন্য বিশ্লেষণের স্তর সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে যা বলেছি, তার ভিত্তিতে তুলনার বিভিন্ন নকশার কথা চিন্তা করা যায়। তুলনার একটি সহজ নকশা হল কোনও ইউনিটকে তার নিজের সঙ্গেই সময়ের ব্যবধানে তুলনা করা। সরল হলেও এটি এমন এক নকশা যা লিজফার্টের বক্তব্য অনুসারে যত বেশী সম্ভব "স্বনির্ভর পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির ভিন্নতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যায় ও কন্ট্রোল ভেরিয়েবলগুলির ভিন্নতাকে নিম্নতম মানে নামিয়ে আনে।" অন্যভাবে প্রকাশ করলে, এর ভিত্তি হল "সর্বাধিক সাদৃশ্য" কৌশলটি। যেহেতু কোনও ইউনিটকে তার নিজের সঙ্গেই তুলনা করা হচ্ছে, ইউনিটের বৈশিষ্ট্যগুলির (সাংস্কৃতিক বা কাঠামোগত) ভিন্নতা শূন্যের কাছাকাছি হতে পারে, যদি না কোনও সাংস্কৃতিক বা কাঠামোগত উপাদান নিজেই এক স্বনির্ভর পরিবর্তনশীল উপাদান হয়। অর্থাৎ যদি না আমরা আলোচ্য

ইউনিটের উপর কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বা কাঠামো পরিবর্তনের প্রভাব অনুসন্ধান করতে মনস্থ করি। এই ধরনের কোনও নকশার চেহারা হবে এই রকম ঃ

$$Ux_{t_1} \sim Ux_{t_2}$$

অর্থাৎ একই ইউনিটকে (ইউনিট x) তার নিজের সঙ্গেই দুটি বিভিন্ন সময়ে (t_1.....t_2) তুলনা করা হচ্ছে। রাজনীতির উপর ব্যক্তিত্ব বা শাসনব্যবস্থার প্রভাব বা নীতি উদ্ভাবনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় এই ধরনের তুলনার মাধ্যমে সবথেকে ভালভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি কীভাবে কাজ করেছিল, তার তুলনা করা যেতে পারে। অথবা কেউ পাকিস্তানে আয়ুব খান ও জিয়াউল হকের আমলে সামরিক শাসনের তুলনা করতে পারেন। ই একই নকশার সাহায্যে কোনও দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কোনও সময় জুড়ে সাফল্য ব্যর্থতা বা একই দেশের দুটি জোট (coalition) সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতার তুলনা করা সম্ভব।

কেউ যদি কোনো বড় ইউনিটের (u) বন্ধ ইউনিটগুলির (su) তুলনা করেন, তাহলে কন্ট্রোল ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে "সর্বাধিক সাদৃশ্য" আনা সম্ভব। খণ্ড ইউনিটগুলির তুলনা আড়াআড়ি (cross-sectional) বা লম্বালম্বি (longitudinal), দুই ধরনেরই হতে পারে। যেমন,

১. আড়াআড়ি ঃ $UX_{su_m} \sim Ux_{su_n}$

২. লম্বালম্বি ঃ $UX_{su_{mt_1}} \sim Ux_{su_{mt_2}}$

সুতরাং কেরল (m) ও পশ্চিমবঙ্গো (n) বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম বা মহারাষ্ট্র (m) ও উত্তর প্রদেশে (n) কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রদর্শন বা মহারাষ্ট্র (m) ও আসামে (n) জাতি আন্দোলন (ethnic movement), কেউ ইচ্ছা করলে এগুলির তুলনা করতে পারেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি যেহেতু একইরকম (x), সেহেতু সংবিধান, আইনি ব্যবস্থা, বড় মাপের সাংস্কৃতিক, কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক উপাদানগুলির একই থাকে, যার ফলে অল্প সংখ্যক খণ্ড ইউনিটের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া যায়।

কোনও নীতির কার্যকারিতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে খন্ড ইউনিটের স্তরে লম্বালম্বি (সময়ের ব্যবধানে) তুলনার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল কানেকটিকাটে জোরে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে ডোনাল্ড টি ক্যাম্পবেল ও এইচ লরেন্স রস-এর গবেষণা (যা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড সার টাফটি সম্পাদিত The Quantitative Analysis of social Problems-এর অন্তর্ভুক্ত)। ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের কানেকটিকাট প্রদেশে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। বছরের শেষে রাজ্যপাল কানেকটিকাটের রাস্তায় গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক কঠোর আইন চালু করেন। পরের বছরের দুর্ঘটনার সংখ্যা শতকরা ১২.৩ হ্রাস পায় এবং রাজ্যপাল একে ওই আইনের সাফল্য বলে দাবি করেন। রাজ্যপালের দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য লেখকরা এই আইন চালু করাকে এক 'গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' ('critical event') আখ্যা দেন এবং এই 'ঘটনা'-র আগে (t_1)ও পরে (t_2) কানেকটিকাটে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ধরনগুলির তুলনা করেন।

নতুন আইন

-

$$Su_{mt_1} \sim Su_{mt_2}$$

তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফলকে আরও বৈধতা দিতে লেখকরা ওই একই সময়ে অন্যান্য খণ্ড ইউনিটগুলিতে (কানেকটিকাটের প্রতিবেশি রাজ্যগুলি) মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুগুলিকে 'কন্ট্রোল গ্রুপ' হিসাবে তুলনার আওতায় এনে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন। এর ফলে তা সময় জুড়ে চালানো বহু খণ্ড ইউনিটের এক তুলনায় পরিণত হয়। লেখকরা যদিও এক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড (interrupted) বা বিচ্ছিন্ন সময়-বিন্যাস (timeseries)-এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন (বা অধিকভাবে বললে আধা-পরীক্ষামূলক পদ্ধতি), এর থেকে স্পষ্ট হয় খণ্ড ইউনিটের স্তরে কোনও বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মনোযোগী তুলনা কীভাবে সম্ভব র ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

অনেকগুলি খণ্ড ইউনিটের তুলনার মত বহু সম্পূর্ণ ইউনিটকেও সময় জুড়ে (লম্বালম্বি) ও একই সময়ে (আড়াআড়ি) তুলনা করা সম্ভব। যে সব কারণ ও শক্তি তাদের রাজনী তর ছাঁচটি গড়ে তুলেছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করে ১৯৪৭ ও ১৯৯৭ সালের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিবর্তনের তুলনামূলক অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। ট্রিলি-দের The Rebellious Century এই ধরনের এক গবেষণা, যেখানে ভার্বা ও তাঁর সহকর্মীদের রচনা (যার সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) অনেকগুলি ইউনিটের আড়াআড়ি তুলনার ভিত্তি "সর্বাধিক সাদৃশ্য" বা সর্বাধিক বৈসাদৃশ্য", যে কোনো একটিই হতে পারে।

২.৬ তুলনামূলক গবেষণার উপযোগিতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভ্যন্তরে তুলনামূলক রাজনীতি একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয় হিসাবে সেই অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে টিকে আছে, কারণ বিভিন্ন কারণবশত তা যথেষ্ট উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমত, তুলনার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার সাধারণত্ব (commoness) ও অসাধারণত্ব (uniqueness) সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারি। দুটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত আপাত সদৃশ প্রতিষ্ঠান ও য়াগুলির মধ্যে যথেষ্ট অসাধারণত্ব প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, যেমন দুটি ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে অনন্য ঘটনাগুলির মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র সুপরিকল্পিত ও বুদ্ধিদীপ্ত তুলনার মাধ্যমেই আমরা এই অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলিকে খুঁজে বার করতে ও উপলব্ধি করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, তুলনা কোনো দৃষ্টান্ত বা ঘটনাকে এক বৃহত্তর পটভূমিতে স্থাপন করতে সাহায্য করে এবং এর ফলে আমরা তাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। পিটার মার্কি যেমন বলেছেন, "তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি আরও গভীর করে তোলে। বৈপরীত্যের মুখোমুখি হয়েই মানুষ তার ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক পরিচয় বা রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে আরও উপলব্ধি করতে পারে। যেমন, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে ভারতীয় গণতন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে না। এই ধারণা সঠিক হতেই পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাকে এক ভিন্ন আলোকে (সম্ভবত আরও উৎকৃষ্ট আলোকে) দেখা যেতে পারে, যদি আমরা তাকে আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলিতে (যাদের সঙ্গে অন্যথা আমাদের অনেক সাদৃশ্য আছে) যা ঘটছে তার বিপরীতে স্থাপন করি।

তৃতীয়ত, তুলনামূলক গবেষণা জাতিকেন্দ্রিকতার (ethnocentrism) বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করতে পারে। জাতিকেন্দ্রিকতা এমনই এক বিশ্বাস যা মনে করে, কারুর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতিগুলি, অথবা আরও সাধারণভাবে কারুর নিজস্ব জীবনযাত্রার প্রণালী, অন্য যে কারুর থেকে উৎকৃষ্টতর। এই বিশ্বাসই বিশ্বাসীদের চিন্তা ও আচরণের বিষয়বস্তু ও ধরন নির্ণয় করে। কেউ অন্যদের গ্রহণ করবে না কি বর্জন করবে, তা নির্ণয় করে অন্যরা কতটা 'তার মতন'—সেই সাদৃশ্যের মাত্রাটুকু। সদৃশ ও বিসদৃশ, বহু অন্য বস্তুর সামনে তাকে উন্মুক্ত করে এবং জীবনযাপনের বিভিন্ন ধার র সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে তুলনামূলক গবেষণা মানুষকে নম্রতা, সংবেদনশীলতা, উপলব্ধির ক্ষমতা এবং অনেক দিক থেকে বিচার করলে অন্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা দিয়ে থাকে। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে তুলনাবাদীরাই জাতিকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন ও তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

চতুর্থত, জি কে রবার্ট বলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, সাংবিধানিক আকৃতি ও পদ্ধতি, এবং আইনি ব্যবস্থাগুলির বিকল্প অভিজ্ঞতাগুলির শক্তি ও দুর্বলতাগুলি প্রকাশ করে তুলনামূলক গবেষণা তাদের স াব্য সুবিধা ও অসুবিধাগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—অন্যান্য দেশে সেগুলি উপযোগী হবে কি না, তা বোঝার জন্য যেগুলি অত্যন্ত কাজে আসবে।

পঞ্চমত, যেমন ভোগান ও পেলাসি দেখিয়েছেন, তাঁদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তুলনামূলক গবেষকরা সমাজতাত্ত্বিক বিধির অ ষণ করেন ও সামাজিক ঘটনাবলীর সাধারণ কারণগুলি প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। আগেই বল হয়েছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে তুলনামূলক পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার (controlled experiment) বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে এবং একটি সীমার মধ্যে কার্য-কারণের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে। ঘটনাগুলির কুশলী নির্বাচন ও চালনার মাধ্যমে তুলনাবাদীরা কৌতূহ দ্দীপক, চিত্তাকর্ষক, এবং অনেক কিছু প্রকাশ করে, এরকম আন্তঃসম্পর্কগুলি আবিষ্কার করতে পারেন। জি কে রবার্ট যেমন বলেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট দিকগুলি সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্ম দিতে পারে, তার পরিমাণ বিশাল।

ষষ্ঠত, বড় মাপের সামাজিক ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্যগুলির আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক প্রকল্পগুলি সূত্রাকারে প্রকাশ করা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে তুলনামূলক গবেষণা যথেষ্ট সাহায্য করে। গণতন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত, সামাজিক বহুত্ব ও রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় তত্ত্ব, রাজনৈতিক সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রগতি, দল ব্যবস্থা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া, সংগঠন ও গোষ্ঠীতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা বহু চিত্তাকর্ষক প্রকল্পের জন্ম দিয়েছে ও সেগুলি যাচাই করেছে।

সপ্তমত, বর্গীকরণ বা শ্রেণিবিভাজনের ক্ষেত্রে তুলনার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, সুসম্বন্ধ জ্ঞান অর্জনের পথে যা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়াও তুলনা যখন ব্যাখ্যায় পৌঁছে দেয়, তখন তা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতেও সহায়ক হয়। বর্গীকরণ ও পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলক রাজনীতির সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও, শুধুমাত্র তুলনামূলক গবেষণার সাহায্যেই তা করা সম্ভব।

সবশেষে, তুলনামূলক গবেষণা রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে প্রসারিত করে। মার্কি যেমন বলেছেন "যে বিশ্বে আমরা বাস করি, সেই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের সংগ্রহ, বিন্যাস ও প্রসারের ক্ষেত্রে তুলনামূলক রাজনীতির অবদান আছে।

২.৭ তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনৈতিক তত্ত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তুলনামূলক রাজনীতি বিষয়ক গবেষণা সুসম্বন্ধ তত্ত্বের উপর কোনওরকম গুরুত্ব আরোপ করত না।

এই বিষয়ের বেশীরভাগ গবেষকই কোনও এক বা একাধিক দেশ সম্পর্কে আকৃতিগত-বর্ণনামূলক অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকতেন, অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরম্পরাগত কিছু মূল্যবোধও বিশেষ কিছু রাজনৈতিক ভাবনা তাঁদের রচনাকে প্রভাবিত করত। এই ধারণা ও মূল্যবোধগুলিকে প্রয়োগ করার কোনও বাসনা তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। যেমন ওয়েবার, মোসকা বা প্যারেটোর মত রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা কিছু আকর্ষণীয় ভাবনার জন্ম দিয়েছিলেন, ে ানও কোনও সময়ে তুলনার মাধ্যমে সেগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির সামগ্রিক চরিত্রটি ছিল অ-তাত্ত্বিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অবশ্য পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

১৯৫০-এর দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যখন 'আচরণবিধি সংক্রান্ত বিপ্লব' (behavioural revolution) ঘটেছে, ঠিক সেই সময়েই প্রথাসিদ্ধ চর্চায় গভীর অসন্তোষ নিয়ে তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য আকুল অনুসন্ধান শুরু হয়। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পর্যবেক্ষণ, সত্যতা নিরূপণ, পদ্ধতিগত আধুনিকতা, ঘটনা-উপযোগিতার পার্থক্য, জ্ঞানের সুসম্বন্ধীকরণ (systemization) ও একীকরণ (integration) ইত্যাদির উপর আচরণবাদের গুরুত্ব তুলনামূলক গবেষণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তুলনাবাদীরা পেয়ে যান যা তাঁরা খুঁজছিলেন : মুখী গবেষণার চাবিকাঠি। এর ফলে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে তুলনামূলক গবেষণা কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা (structural functionalism) ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মত বিস্তৃত তাত্ত্বিক কাঠামো আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন, গোষ্ঠীতত্ত্ব (group theory), এলিট তত্ত্ব, শ্রেণী বিশ্লেষণের মত কিছুটা সংকীর্ণ তাত্ত্বিক সূত্র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

১৯৭০-এর দশক শেষ হবার আগেই কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়. প্রথমেই, পরিমাপ ও সংখ্যায় প্রকাশ করায় বিশ্বাসী পদ্ধতিগত আধুনিকতার বিষয়টি এক বিতর্কের জন্ম দেয় এবং জিওভানি সারতোরি-র মতে, চিন্তাবিদেরা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ছিলেন "অচেতন চিন্তাবিদেরা" ('unconscious thinkers'), যাঁরা অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের যুক্তি ও পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলেন না, এবং ছিলেন "অতিসচেতন চিন্তাবিদেরা" (Overconscious thinkers') যাঁরা আদর্শ প্রকৃতি বা পদার্থ বিজ্ঞানের মাপকাঠি ও পদ্ধতিগুলি ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মত সাড়ম্বর গুলি সম্পর্কে বহু

গবেষকেরই মোহভঙ্গ ঘটে। জোসেফ লা প্যালোমবারার মত তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সবথেকে বেশী বিভ্রান্তি দেখা দেয় সামগ্রিক বা সার্বিক গুলির স্তরে। তাঁরা তত্ত্বনির্ভর থাকতে চাইতেন, কিন্তু মাঝারি স্তরের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যাগুলির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে চাইতেন।

তৃতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের মত সংকীর্ণ তাত্ত্বিক সূত্রগুলি প্রয়োগ করে অনেকেই সন্তোষজনক ফলাফল পেতে সক্ষম হননি। সেই কারণে তাঁরা এগুলির মৌলিক পরিবর্তনের বা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। "আধুনিকীকরণ সংশোধনবাদ" ("modernization revisionism" যা রাজনৈতিক সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে), নির্ভরতা তত্ত্ব (dependency theory), নয়া-মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মত শ্রেণিগুলি এঁরাই সৃষ্টি করেন। একইভাবে, গোষ্ঠীতত্ত্ব, বহুত্ব ও পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের বিবর্তন নিয়ে কর্মরত গবেষকরাও সমস্যার সম্মুখীন হন এবং নয়া কর্পোরেটবাদ-এর (neo-corporatism) মত বিকল্প সূত্রগুলিকে আরও উপযোগী মনে করেন।

চতুর্থত, আরও প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষণা চালানো সত্ত্বেও কিছু গবেষক বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে উল্লেখযোগ্য তুলনামূলক কাজের দৃষ্টান্ত রাখেন (যেমন ব্যারিংটন মুর, পরে থেডা স্কোপোল ইত্যাদি)।

সবশেষে, এমন কিছু গবেষক ছিলেন তাঁরা তাত্ত্বিক বিষয়গুলিতে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না ও লিজফার্টের ভাষায় 'অ-তাত্ত্বিক কেস স্টাডি' চালিয়ে যেতেন, প্রাথমিকভাবে যা হল এক একটি দেশ সম্পর্কে বর্ণনামূলক আলোচনা।

সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, এই শেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত গবেষকরা ছাড়া সকলেই তাঁদের গবেষণাকে তাত্ত্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক ও উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছিলেন। সাড়ম্বর সামগ্রিক কোনও কারুর মনে তেমন ছাপ না ফেলতে পারলে তিনি মাঝারি বিস্তারের গুলি নিয়ে কাজ করতেন অ বা যদি কেউ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার পক্ষপাতী হতেন, তাহলে তিনি কিছু সংসগঠিত ব্যাখ্যা বা প্রস্তাব পেশ করতে চাইতেন। কাজেই, তুলনামূলক রাজনীতি একদিকে ত সম্পর্কে অবহিত থাকলেও, আজকের দিনে কোনও সর্বজনস্বীকৃত সাড়ম্বর তত্ত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। সিডনী ভাঠা যেমন বলেছেন, "অর্থনীতির যেরকম আছে, তুলনামূলক রাজনীতির সেরকম কোনও কেন্দ্রীয় ধাঁচ নেই যা গবেষকদের পথ দেখাবে। বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতার ইচ্ছা, ঐকমত্যে উপনীত হ য়া ভাবনা ও উপলব্ধি ও বিষয়টি সম্পর্কে সঞ্চিত সিদ্ধান্তের কথা বিচার করলে এই অভাব স্পষ্টতই এক দুর্বলতা। কোনও একটি পূর্ণাঙ্গ, এককৃত মডেল ও স্বতঃসিদ্ধের সংগ্রহের অভাব দুঃখজনক।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্যাব্রিয়েল আমন্ড যে উপমা ব্যবহার করেছেন, তুলনামূলক রাজনী ক্ষেত্রেও সেটি সমানভাবে প্রযোজ্য: "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা ও গোষ্ঠাগুলি এখন আলাদা আলাদা টেবিলে বসে থাকে—তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা, কিন্তু প্রত্যেককেই সযত্নে রক্ষা করতে হয় তাদের নিজস্ব গোপন, অরক্ষিত কোনও দ্বীপকে।"

কিন্তু তুলনাবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও মূল ধারণাগুলির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তুলনামূলক রাজনীতির প্রাক-তাত্ত্বিক যুগে ফিরে যাওয়ার কোনও বাসনা তাঁদের নেই। "১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের

প্রথম দিকের স্বর্ণযুগে" এক বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক রাজনীতি ও নতুন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সৃষ্টির জন্য যে 'বিপ্লবের' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু রাসেল জে ডালটন যেমন বলেছেন, "এটা সত্যি যে আচরণবিধি সংক্রান্ত বিপ্লব আগেকার ব্যবস্থাকে হটিয়ে দেয়নি, কিন্তু তা তুলনামূলক রাজনীতির প্রকৃতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছে।"

এই রূপান্তরের প্রতিফলন দেখা যায় আজকের তুলনাবাদীদের এই স্বীকারোক্তিতে যে, তত্ত্ব-সচেতনতার দ্বারা পরিচালিত হলে তুলনামূলক রাজনীতি আরও অনেক উন্নতি করতে পারে যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও বক্তব্যগুলি তুলনামূলক গবেষণার সাহায্যেই সবথেকে ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার জন্য তুলনামূলক রাজনীতি যদি গবেষণাগারের কাজ করতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক তত্ত্ব তুলনামূলক রাজনীতিতে সুসম্বন্ধ গবেষণাকে আরও উন্নত করে তুলতে পারে।

পঁচিশ বছর আগে জেমস বিল ও রবার্ট হার্ডগ্রেভ জুনিয়র দেখিয়েছিলেন তত্ত্ব কত রকম উপায়ে তুলনামূলক গবেষণাকে সাহায্য করতে পারে। যেহেতু সেগুলি এখনও প্রাসঙ্গিক, সেহেতু তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করব।

বিল ও হার্ডগ্রেভের মতে, তথ্যের নির্বাচন, সংগ্রহ, বিন্যাস ও সঞ্চয়ে তথ্য সহায়তা করে। তত্ত্ব এক সুতোর মত কাজ করে, যা তথ্যের মধ্য দিয়ে যাবার সময় প্রাসঙ্গিকগুলি তুলে নেয় ও অপ্রাসঙ্গিকগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব-সচেতনতা গবেষণায় ধারণাগত পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা আনতে তুলনাবাদীদের বাধ্য করে। তৃতীয়ত, তত্ত্বের অনিবার্যরূপেই এক 'সম্পর্কজনিত চাপ' ('relational stress') থাকে : তত্ত্ব প্রয়াস করে সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিতে, ঘটনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক ও সেতু রচনা করতে। রাজনীতির বিশ্বে কাঠামো ও প্রক্রিয়াগত তথ্যের নকশা ও আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করতে এ তুলনাবাদীদের সাহায্য করে।

চতুর্থত, তত্ত্বের ক্ষমতা আছে কাল ও স্থানের সীমা অতিক্রম করার। যদি কোনও তুলনাবাদী তত্ত্ব-সচেতন হন, তাহলে কোনও একটিই ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সময়েও তিনি ওই ঘটনাটির নির্দিষ্টতাকে (particularism) অতিক্রম করার বাধ্যবাধকতা অনুভব করবেন। পঞ্চমত, তত্ত্ব নিজেই ব্যাখ্যার এক রূপ। তত্ত্বে আগ্রহী কোনও তুলনাবাদীকে 'কেন' প্রশ্নটি তুলতেই হবে, অর্থাৎ নিছক সরল বর্ণনার গন্ডিকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

তত্ত্ব সংক্ষিপ্তকরণেও সহায়তা করে। একগুচ্ছ তত্ত্ব পেশ করা কোনও কাজের কাজ নয়, যদি না সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে ও তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলিকে প্রকাশ করে কোনো গবেষক কোনও অর্থপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারেন।

এছাড়াও, "নতুন সমস্যা নির্বাচনে ও নতুন গবেষণায় উদ্দীপনা যোগাতে তত্ত্ব এক প্রেরণাদায়ী শক্তি হিসাবে কাজ করে। কাজেই, তত্ত্বের সাহায্যে নিয়ে তুলনামূলক রাজনীতি শুধুমাত্র বিষয় হিসাবে নির্বাচিত দেশগুলি সম্পর্কেই আমাদের আরও বেশি তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে নামে না, তা একই দেশগুলি বা নতুন নতুন দেশ সম্পর্কে আরও গবেষণা চালাতে উদ্দীপনা যোগায়।"

সবশেষে, তত্ত্ব ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে আমাদের সাহায্য করে। এই ধরনের পূর্বাভাসকে 'পোস্টডিকশন'-এর (post-diction) মাধ্যমে আরও সহজসাধ্য করে তোলা যায়। ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, মনোযোগী বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সামান্যীকরণের প্রয়াস, পেশ করা বক্তব্যের সীমাবদ্ধতাগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা—এই সবই তত্ত্ব-সচেতন তুলনাবাদীদের এমন রচনায় সাহায্য করবে, যা পূর্বাভাস দেবার ক্ষমতা রাখে।

২.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১. Robert T. Holt and John E. Turner (eds.). The Methodology of Comparative Research (New York : Free Press. 1970)

২. Adam Przeworski and Henry Teune. The Logic of Comparative Social Iuquiry (New York : Joha wiley, 1970).

৩. Arend Lijphart. "Comparative Politics and the Comparative Method." American Political Science Review 65. (September. 1971).

৪. Ivan vallier (ed.). Comparative Methods in Sociology (Berkeley : University of Califoraia Press. 1971).

৫. Arend Lijphart : "The Comparative Cases Strategy in Comparative Research. "Comparative Political Studies. July 1975.

৬. R. Chatterji. Methods of Political Inquiry (Calcutta : The Wrold Press. 1979).

৭. James A. Bill and Robert H. Hardgrave. Comparative Politics : The Quest for Theory (Washington D. C. : University Press of America. 1981)

৮. R. H. Chilcote. Theories of Comparative Politics (Boulder, Westview. 1981)

৯. Theda skocpol (ed). Vision and Method in Historical Sociology (Cambridge : Cambridge University Press. 1984).

১০. Else Oyen (ed). Comparative Methodology : Theory and Practice in International Social Research (London : Sage. 1990)

১১. William Crotty (ed). Political Science : Looking to the Future vol. II : Comparative Politics. Policy and International Relations (Evanston. III. North-Western University Press. 1991)

১২. Daniel P. Franklin and Michael J. Baun (eds.) Political Culture and Constitutionalism—A Comparative Approach (New York : M E Sharpe 1995)

একক ৩ তুলনামূলক রাজনীতিচর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ কাঠামোগত ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৩ তুলনামূলক রাজনীতিতে কাঠামোগত ব্যবহারিক বিশ্লেষণ

৩.৪ গ্যাব্রিয়েল আমন্ডের কাঠামোগত ব্যবহারিকতা

৩.৫ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৬ তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৭ নয়া প্রতিষ্ঠানতন্ত্র

৩.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ভূমিকা

আগের অধ্যায়ে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তুলনামূলক রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছি। সময়ের সাথে কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষে র মত বহু বিস্তৃত তত্ত্বগুলি জনপ্রিয়তা হারালেও, এমনকি তাদের অপযশ ছড়িয়ে পড়লেও তুলনামূলক গবেষণার জন্য কিছু তাত্ত্বিক নির্দেশিকার প্রয়োজন তখনও অনুভব করা হত। ১৯৬০, ৭০, ৮০-র দশক জুড়ে মাঝারি বিস্তারের, এমনকি সংকীর্ণ কেন্দ্রবিন্দুর কিছু ধারণাগত কাঠামোর প্রস্তাব ও ব্যবহারের পরে আজ তুলনাবাদীরা আবার অনুভব করতে পারছেন যে আমাদের ধারণাগত জগতের বৈচিত্র্য ও বহুত্বের সংযোগ ঘটানো আবশ্যক। সম্ভবত আমরা বড় বেশি 'তত্ত্বের দ্বীপ' (island of theory) আবিষ্কার করে ফেলেছি। তা ছোট বা বড় যেরকমই হোক না কেন। এখন আমাদের উচিত সেগুলির সবকটির মধ্যে সেতুবন্ধন করা। রাসেল ডালটন যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, এখন আমাদের কৌশল হওয়া উচিত "সচেতনভাবে আমাদের এই দ্বীপগুলির মধ্যে সেতু রচনা করা। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষায়িত (Specialized) জ্ঞান ও দক্ষতার সবথেকে বেশী সুফল পাওয়া যাবে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে একত্রে সংযুক্ত করে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুকে সংকীর্ণ করে তোলার ঝুঁকিকে কি য়ে আনা যাবে।" এই কাজটি দূরূহ হতে পারে : আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়াসের সাহায্যে তা করে ওঠা সম্ভব নাও হতে পারে। বহু বছর ধরে বহু গবেষকের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াসই এই কাজ সম্পাদন করতে পারে। এই পন্থা অনুসরণ করে কিছু প্রয়াস চালানোর পরেও আমরা এমন কোনও ফলাফল নাও পেতে পারি, যা বিশ্বজনীন স্বীকৃতি দূরের কথা, অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য

হবে না। এবং এই কারণেই আজকের প্রজন্মের ছাত্রদের উচিত অতীতের সাধারণ পদ্ধতি বা কাঠামোগুলির সঙ্গে যথেষ্টভাবে পরিচিত হওয়া। আরও ভাল কিছুর সন্ধান করতে হলে, আমাদের কাছে এক সময় যা দেওয়া হয়েছিল, তাকে জেনেই তার থেকে সরে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

সুতরাং এই অধ্যায়ে আমরা তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩.২ কাঠামোগত-ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের সঙ্গে কাঠামোগত-ব্যবহারিকতাকে তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের এক বহু পরিচিত সাধারণ পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে মনে করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে গ্যাব্রিয়েল আমন্ডের নাম। তাঁর Politics of Developing Areas গ্রন্থে এই কাঠামোটির প্রস্তাব করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি ধারণার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তুলনামূলক রাজনীতিকে অ্যাড-হকিজম বা তদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে আনতে চান ও একই সঙ্গে তখনও প্রচলিত আইনি ও প্রতিষ্ঠানগত শব্দভাণ্ডার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। আমন্ডের মতে এই নতুন পদ্ধতিই ছিল 'উন্নয়নশীল' অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর তুলনার প্রথম প্রচেষ্টা, এবং একটি সাধারণ শ্রেণী বা বর্গের গুচ্ছ অনুসারে তাদের সুসম্বন্ধ তুলনার প্রথম নিদর্শন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কাঠামোগত-ব্যবহারিক পদ্ধতি বা এ সম্বন্ধে আমন্ডের সূত্র নিয়ে আলোচনা করার আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেখান থেকে তাকে আহরণ করেছে, সেই নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে এই পদ্ধতি কীভাবে বিকাশ লাভ করেছে, সেই বিষয়ে আমাদের সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডার্কহেইমের রচনায় ব্যবহারিকতার উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহারিকতার স্বত সিদ্ধগুলির উপর ভিত্তি করেই তিনি ধর্ম বা শ্রম বিভাজন সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান চালান। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনের হাতে ব্যবহারিকতার সূত্রগুলি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন লক্ষ্য করেন যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ধারণার ভিত্তি হল সামাজিক সত্তা ও জৈবিক সত্তার অনুরূপতা (analogy)। যে কোনও জীবদেহ (organigm) নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে : তার প্রতিটি অংশের কাজকর্মই এক দিক থেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কারণ তারা একত্রে জীবদেহের পক্ষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি সম্পাদন করে, অর্থাৎ তাকে টিকিয়ে রাখে বা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহারিকতাবাদীরা সমাজকে এক জৈবিক অস্তিত্ব অর্থাৎ টিকে থাকার লক্ষ্য নিয়ে এক সম্পূর্ণ বা সমগ্র সত্তা হিসাবে দেখেন।

মেরিয়ন লেভি ব্যবহারিকতার মৌলিক প্রশ্নটিকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য কী করা প্রয়োজন? এখানে 'ফাংশন' শব্দটি এর ভিত্তিতে গঠিত। টিকে থাকার লক্ষ্যে যে কাজকর্ম বা প্রক্রিয়া সাহায্য করে, তাকেই ব্যবহারিক বলা যায়।

ব্যবহারিক পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি আগে থেকে কিছু অনুমান করে নেয় প্রথমত, সমগ্র ব্যবস্থাটিই হল

বিশ্লেষণের ইউনিট ; দ্বিতীয়ত, সমগ্র ব্যবস্থাটির রক্ষণাবে ণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট কাজ করা আবশ্যক এবং তৃতীয়ত, ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ কাঠামোগুলি ব্যবহারিক দিক থেকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, ব্যবহারিক বজায় রাখতে ব্যবস্থাটির সবকটি অংশ একত্রে সব প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদন করে। ব্যবহারিক বিশ্লেষণের লক্ষ্য হল ব্যবস্থার অন্তর্গত কাঠামো ও প্রক্রিয়াগলিকে চিহ্নিত করা: এই কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে কাজ করে তার বর্ণনা করা ও ব্যবস্থার সামগ্রিক কাজকর্মে এই কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলির কাজের অবদান কতখানি তার মূল্যায়ন করা, অর্থাৎ আত্ম-রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা কতখানি সহায়তা করে, তা খতিয়ে দেখা।

প্রতিটি জীবদেহের মত প্রতিটি সমাজ তার প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে বাধ্য হলেও, সেগুলি সম্পাদন করার জন্য কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলি প্রতিটি সমাজে একইরকম নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কাঠামোগুলিকে বহু ব্যবহারিক (multi-functional) ধরে নেওয়া হয়, কারণ ব্যবহারিক বিশেষায়ন (functional specialization) ও কাঠামোগত পৃথকীকরণের (structural differentiation) ক্ষেত্রে সমাজগুলির মধ্যে অমিল থাকতে পারে। অ্যামিবার (ambea) মত সরল ও মানুষের মত জটিল জীবদেহ যেমন থাকতে পারে, তেমনই সরল ও জটিল, দুই ধরনের সমাজও থাকতে পারে, যাদের সরলতা ও জটিলতাকে ব্যবহারিক বিশেষায়ন ও কাঠামোগত পৃথকীকরণের প্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে। এখানে কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, যেহেতু তা ব্যবহারিক বিশেষায়ন ও কাঠামোগত পৃথকীকরণকে উন্নয়নের সূচক হিসাবে দেখতে আগ্রহী বোধ করে।

ট্যালকট পারসনের সমাজ ব্যবস্থার মডেলটি প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলির চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে গঠিত। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য সমাজকে যে কাজগুলি করতে হয়, সেইগুলি। তিনি এই ধরনের চারটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন : (১) ছাঁদ বা ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ (Pattern maintenance), (২) লক্ষ্য সিদ্ধি (goal attainment), (৩) নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া (adaptation) ও (৪) বিভিন্ন অংশের সমাকলন (integration)।

৩.৩ তুলনামূলক রাজনীতিতে কাঠামোগত-ব্যবহারিক বিশ্লেষণ

উইলিয়াম ফ্ল্যানিগনি ও এডউইন ফোগেলম্যান রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ব্যবহারিকতা প্রয়োগ করার তিনটি পৃথক রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটিকে তাঁরা বলেছেন 'বিবিধগ্রাহী ব্যবহারিকতা' (eclectic functionalism), অর্থাৎ যা বিভিন্ন সূত্র বা উপাদান দিয়ে গঠিত। সহজ করে বললে এর অর্থ হল কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তা কী কী কাজ করে সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। অর্থাৎ, কারুর অনুসন্ধানের বিষয় যদি হয় রাজনৈতিক দলগুলি, তাহলে তিনি এই স্বরূপের প্রশ্ন তুলবেন: সমাজে অথবা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি কী কী কাজ করে ? একইভাবে, কোনও ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, সর্বোচ্চ আদালত, আইনি প্রক্রিয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

এই দিক থেকে বিচার করলে আমরা সকলেই 'ব্যবহারিকতাবাদী', কারণ তার কাজকর্ম সম্পর্কে

অনুসন্ধান না করে আমরা সচরাচর বিষয় সম্পর্কে তদন্তে নামিনা। কিন্তু এই ধরনের ব্যবহারিকতাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যে কেউ এবং প্রত্যেকেই একে গ্রহণ করতে পারে। কারণ এর জন্য ব্যবহারিকতাবাদীদের স্বতঃসিদ্ধ বা তাঁদের প্রস্তাবিত গবেষণামূলক প্রশ্নগুলি অনুসরণ করে চলার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। দ্বিতীয়ত, 'বিবিধগ্রাহী ব্যবহারিকতার ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র ভাবে কাজকর্মগুলির নয়, গবেষক অন্যান্য অনেক দিকের সাথে সাথে কোনও বিষয়ের কাজকর্ম সম্পর্কেও অনুসন্ধান করতে সম্মতি দেন। কাজেই কাজকর্মগুলি বুঝতে চাওয়া ছাড়াও কেউ ওই একই বিষয়ের ইতিহাস, সংগঠন, বিবর্তনের ধরন, মতাদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে পারেন।

অন্যভাবে বললে, এখানে কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান হল একটি বৃহত্তর গবেষণা পরিকল্পনার নিছক একটি অংশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, কাজকর্ম এখানে বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু নাও হতে পারে।

সংজ্ঞা অনুসারে এই ধরনের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলে অপরিকল্পিত, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যজনিত, অ-তাত্ত্বিক ও শিথিল থেকে যাবে।

ব্যবহারিকতার দ্বিতীয় রীতিটিকে ফ্ল্যানিগান ও ফোগেলম্যান অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতা বলেছেন। এই রীতিতে কোনও সাধারণ ব্যবহারিকতার তত্ত্বের অনুগত না হয়ে রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি আরও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা হয়। কাজকর্মকে কোন রাজনৈতিক বিষয়ের বহু দিকের মধ্যে একটি না ভেবে বিশ্লেষকরা বরং সবথেকে সম্ভাবনাময় অভিমুখ হিসাবে তাকেই অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছেন।

অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদীরা সামগ্রিকতাবাদী (holist) নন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কোনও সমাজের দর্শন সম্পর্কে তাঁদের তেমন আগ্রহ নেই। বরং তাঁরা সমাজের ভিতরে নির্দিষ্ট পদার্থ বা সত্তাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চান ও ব্যক্তির দাবি বা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে তারা কী কী কাজ করে সেই সম্বন্ধে অবহিত হতে চান।

এই ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ পাওয়া যায় রাজনৈতিক যন্ত্রের (political machine) কাজকর্ম সম্পর্কে রবার্ট মার্টনের গবেষণার মধ্যে। তাঁর গবেষণার মার্টন 'প্রতীয়মান' (manifest) ও প্রচ্ছন্ন (latent) কাজকর্মগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি হল রাজনৈতিক যন্ত্রের 'স্পষ্ট ও উদ্দিষ্ট' পরিণতি এবং দ্বিতীয়টি হল তার ছদ্ম ও অনভিপ্রেত পরিণাম। যত দূর অবধি প্রতীয়মান এবং/অথবা প্রচ্ছন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক যন্ত্রগুলি ব্যক্তির কিছু দাবি মেটাতে পারে, ততদূর পর্যন্ত তারা এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রাজনৈতিক যন্ত্রকে সবথেকে চিত্তাকর্ষক মনে হয় ও তাকে সবথেকে ভালভাবে বোঝা যায়।

মেক্সিকান রেভলিউশনারী পার্টির সামাজিক-রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে প্যাজেন্টের অনুসন্ধান বা কোনও দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে ছোট ছোট দলগুলির উদ্ভাবনী কাজকর্ম সম্পর্কে লোউই-র গবেষণা অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদের জন্য দুটি দৃষ্টান্ত। এই সবকটি ক্ষেত্রেই গবেষকরা কাজকর্মকে এই সব সত্তা বা পদার্থগুলির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করেছেন এবং সেই ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা

চালিয়েছেন।

কাজেই 'অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতা' 'বি ধগ্রাহী ব্যবহারিকতা'-র থেকে পৃথক এই অর্থে যে, কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রথমটি দ্বিতীয়টির মত পরিকল্পনাহীন নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ঘটনা বা বিষয়গুলিকে তাদের কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই সবথেকে ভালভাবে বোঝা সম্ভব। এই কারণেই অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদীরা কাজকর্মের ধারণাটি আরও পরিশীলিত করে তুলতে এবং এক সুপরিকল্পিত উপায়ে তাকে এক অভিজ্ঞতালব্ধ ভিত্তি প্রদান করতে উদ্যোগী হন।

অন্য দিকে, অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদীরা আবার তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন, যাঁরা ব্যবহারিকতার তত্ত্বে বা এই ধারণাটিতে বিশ্বাস করেন যে, সামগ্রিকভাবে সমাজ নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে ও তাকে কিছু কাজ করতেই হয়, যে সমাজের সব কিছুকেই এই কাজগুলির সাথে সংযুক্ত করা যায় ও এই যোগসূত্রের আলোকেই তাদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা যায়। অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদীরা তাঁদের গবেষণার বিষয়গুলি সম্পর্কে যখন অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তগুলিতে বেশী আগ্রহী, তখন আরও অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যবহারিকতাবাদীরা ব্যবহারিকতার কাঠামোর তাত্ত্বিক গুরুত্বের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করেন। অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারিকতাবাদীরা সামগ্রিক ভাবে সমাজের 'ব্যবহারিক প্রয়োজন' জাতীয় ভাবনার সঙ্গে একেবারেই জড়িত থাকতে চান না।

'কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা' হল তৃতীয় ধরনের ব্যবহারিকতা, যাকে ফ্ল্যানিগান ও ফোগেনম্যান চিহ্নিত করেছেন। রাজনীতি-সংক্রান্ত গবেষণার ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের এটাই হল সবথেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ট্যালবট, পারসনস, এবং মেরিয়ন লেভির রচনাগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনাবাদীরা ব্যবহারিকতার তত্ত্বে সমাজ রাজনীতির সামগ্রিকতা বিশ্লেষণের জন্য এক প্রশস্ত ও সাধারণ কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলেন। ব্যবহারিকতাবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ যথেষ্ট গভীর হলেও গ্যাব্রিয়েল আমন্ডের পরিকাঠামোটিকে সবথেকে স্পষ্ট ও সুসম্বন্ধভাবে ব্যক্ত বলা যেতে পারে।

৩.৪ গ্যাব্রিয়েল আমন্ডের কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা

এক দিকে ফ্ল্যানিগন এবং ফোগেলম্যান ও অন্যদিকে হোল্ট এবং রিচার্ডসন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিকতার ভূমিকা (আমন্ড যার সবথেকে খ্যাতনামা প্রবক্তা) সম্পর্কে বিপরীত মতামত প্রকাশ করেছেন।

ফ্ল্যানিগন ও ফোগেলম্যান বলেছেন "রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিকতা কোনও সময়েই বিশ্লেষণের প্রচলিত পদ্ধতি ছিল না.....রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিক বিশ্লেষণের আবির্ভাব খুবই সাম্প্রতিক কালে ও আপেক্ষিকভাবে খুব অল্প সংখ্যক রচনাই কোনও ধরনের ব্যবহারিক বিশ্লেষণী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছে।"

ওদিকে রবার্ট টি হোল্ট ও জন এম রিচার্ডসন জুনিয়রের বিশ্বাস : "অল্প কয়েক বছরের মধ্যে আমন্ডের কাঠামো এই বিষয়ের উপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, তা উল্লেখ করার মত। মাত্র এক দশক আগেও স্বার্থের সমষ্টিগঠন (interest aggregation) ও স্বার্থের উচ্চারণ-এর (interest articulation)

মত শব্দগুলি ছাত্রদের কাছে অপরিচিত ছিল। আজ যদি কোনও ছাত্র এগুলির অর্থ না জেনে মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে যায়, তাকে কোনও মতেই বুদ্ধিমান আখ্যা দেওয়া যাবে না। আমন্ডের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়ে তুলনামূলক রাজনীতিতে তত্ত্বের অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব নয়।"

ব্যবহারিক কাঠামোর বেশ কিছু তাত্ত্বিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সর্বজনগ্রাহ্য ও নির্ভরযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপিত করতে সাধারণ তাত্ত্বিক কাঠামোগুলির (যার মধ্যে ব্যবহারিকতাও রয়েছে) ব্যর্থতা সত্ত্বেও, হোল্ট এবং রিচার্ডসনের সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা একমত হতে বাধ্য যে বিতর্কিত হলেও আমন্ডের কাঠামোর প্রভাব অনস্বীকার্য।

আমন্ড মনে করেন যে, 'আবার, পার্থক্যের মাত্রা সংস্কৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি সমাজে যে কাঠামোগুলি রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে', বিশ্লেষণাত্মক উপায়ে তাদের পৃথক করা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য এবং তার সূচনা হওয়া উচিত রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্পষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণের মধ্যে দিয়ে। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক রচনাগুলি পরীক্ষা করে তিনি মনে করেন যে, ম্যাক্স ও য়বারের সঙ্গে ইস্টনের সংজ্ঞার সম্পূণর ঘটালে তা বেশ সন্তাষজনক রূপ নেয়। কাজেই আমন্ডের কাছে রাজনীতি হল এক 'আইনসম্মত বস্তুগত বাধ্যবাধকতা" (legitimate physical compulsion) ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল "সব স্বাধীন সমাজে দৃশ্যমান আন্তঃক্রিয়ার সেই ব্যবস্থা, যা মোটামুটি আইনসম্মত বস্তুগত বাধ্যবাধকতাকে প্রয়োগ করে বা প্রয়োগের ইঙ্গিত দিয়ে সংহতি ও অভিযোজনের (adaptation) কাজটি (অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সমাজের তুলনায়) সম্পাদন করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সেই আইনসম্মত বিধি, যা সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে ও তার রূপান্তর ঘটায়।" এই রাজ নতিক ব্যবস্থাতে নি বশ (input) ও উৎপাদ (output), দুই-ই কোনও না কোনও ভাবে আইনসম্মত বস্তুগত বাধ্যবাধকতার সঙ্গে যুক্ত।

এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে : (১) সর্বাঙ্গীণতা (comprehensiveness), (২) আন্তঃনির্ভরতা (interdependence) ও (৩) সীমারেখার অস্তিত্ব। একটি সর্বাঙ্গীণ, কারণ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমস্ত নিবেশ ও উৎপাদ, যারা বস্তুগত দমননীতি (physical coercion) প্রয়োগ বা প্রয়োগের হুমকিকে প্রভাবিত করে। এটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কারণ কোনও উপ-গোষ্ঠীতে (subset) রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়ার পরিবর্তন অন্যগুলিকেও প্রভাবিত করে। এবং এটি সীমাবদ্ধ, কারণ কোনও এক বিন্দুতে সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয়।

পশ্চিম ইউরোপের বাইরের 'বিচিত্র' (exotic) ব্যবস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে তুলনামূলক রাজনীতির সীমারেখাকে আরও প্রসারিত করতে চেয়ে আমন্ড তুলনামূলক রাজনীতির জগতের অন্তর্ভুক্ত বহু ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির চিহ্নিতকরণ তুলনাবাদীদের এক সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আমন্ড অনুভব করেছিলেন যে এটা দেখানো সম্ভব যে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথক হলেও সেই ব্যবস্থাগুলিকে তাদের কাজকর্মের দৌলতে একই রকমের মনে হতে পারে। তিনি আবার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বর্তমান :

(১) "সরলতম থেকে শুরু করে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থারই রাজনৈতিক কাঠামো আছে।" "কাঠামোগত বিশেষায়নের মাত্রা ও আকৃতির" পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাগুলির তুলনা করা সম্ভব।

(২) সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা "একই কাজকর্ম সম্পাদন করে", কিন্তু তা হতে পারে পুনরাবৃত্তির বিভিন্ন হারে, বিভিন্ন কাঠামোর সাহায্যে ও এক একটি ব্যবস্থায় এক এক রকম ধারায়।

(৩) যদিও প্রাচীন বা আধুনিক, যে ধরনের সমাজেই হোক না কেন, সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহু ব্যবহারিক (multi-functional)। কৃত কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমাজে তারা অন্যান্যদের থেকে বেশি বিশেষায়িত।

(৪) "সাংস্কৃতিক কর্মে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল 'মিশ্র' ব্যবস্থা।" অর্থাৎ, বিশুদ্ধভাবে আধুনিক বা বিশুদ্ধভাবে সনাতন কোনও ব্যবস্থা নেই, যদিও আধুনিকতা বা ঐতিহ্যের আপেক্ষিক প্রাধান্য এক একটি ব্যবস্থায় এক এক রকম।

সুতরাং প্রথম বৈশিষ্ট্যটির অর্থ রাজনৈতিক কাঠামোর বিশ্বজনীতা। কাঠামো বলতে আমন্ড বোঝাচ্ছেন, "আন্তঃক্রিয়ার আইনসম্মত ধরন, যার সাহায্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা শৃঙ্খলা বজায় রাখে।" এই আন্তঃক্রিয়া অনিয়মিত বা নিরবচ্ছিন্ন, ঘনঘন বা সবিরাম হতে পারে—কিন্তু কখনওই তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকবে না। প্রাচীন বা আধুনিক যে ধরনেরই হোক, কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য চরম যদৃচ্ছতা (randomness) হতে পারে না।

একই ভাবে, সব রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরেই রাজনৈতিক কাজকর্মও বিশ্বজনীনভাবে বর্তমান। এই রাজনৈতিক কাজকর্মগুলি কী? এখানে আমন্ড তাঁর অভিজ্ঞতা ও পশ্চিমের জটিল ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের আশ্রয় নেন, "যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিতে সবথেকে বেশি পরিমাণে কাঠামোগত বিশেষায়ন ও ব্যবহারিক পৃথকীকরণ ঘটেছে।" এর ভিত্তিতে তিনি চারটি নি বশে-মূলক কাজ (input functions) এবং তিনটি কর্তৃত্বব্যঞ্জক সরকারি কাজ (authoritative governmental function) বা উৎপাদ-সংক্রান্ত কাজ (output function) চিহ্নিত করেছেন ঃ

সারণি ৩.১

রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির সর্বব্যাপী কাজকর্ম

(Universal functions of political systems)

নিবেশ-সংক্রান্ত কাজকর্ম (input functions)	উৎপাদ-সংক্রান্ত কাজকর্ম (output functions)
১. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও প্রবেশন (recruitment)	১. বিধি প্রণয়ন
২. স্বার্থের উচ্চারণ	২. বিধি প্রয়োগ
৩. স্বার্থের সমষ্টিগঠন	৩. বিধিসংক্রান্ত মীমাংসা বা রায়
৪. রাজনৈতিক যোগাযোগ	

শুধুমাত্র কাঠামোর ভিত্তিতেই যদিও ব্যবস্থাগুলির তুলনা করা সম্ভব, তবুও সে ক্ষেত্রে তার মূল্য খুবই সীমিত। "এটা যেন তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞান (comparative physiology) ছাড়া তুলনামূলক দেহগঠনবিদ্যা (comparative anatomy) চর্চা করা।" দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ইন্দোনেশিয়ার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির (interest groups) তুলনা করতে পারেন, যার জন্য তাঁকে দুই দেশের ওই গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্ণনা করতে হবে। তার পরিবর্তে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে ওই দেশে স্বার্থগুলি কীভাবে উচ্চারিত হয় বা ব্যক্ত করা হয়, তাহলে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে। আমরা এটা আবিষ্কার করতে পারি যে, কোনও ব্যবস্থায় সংগঠিত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি প্রাথমিক ভাবে স্বার্থের উচ্চারক হলেও অন্যান্য ব্যবস্থায় তারা সেই ভূমিকা পালন করে না: তাৎপর্যময়ভাবে এই ভূমিকা পালন করতে পারে আমলাতন্ত্র, প্রতিষ্ঠাবান গোষ্ঠী (status group), সদৃশ গোষ্ঠী (Kinship) ও বংশগত গোষ্ঠী (lineage group) ইত্যাদি। কাজেই এই ব্যবহারিক প্রশ্নটি উত্থাপন করে আমরা যথেষ্ট ভাল ফল পাই।

তৃতীয়ত, আমন্ড রাজনৈতিক কাঠামোর বহু-ব্যবহারিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক কাঠামো অন্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকেই একই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, সেহেতু বহু ব্যবহারিকতা অপরিহার্য। কোনও ব্যবস্থা যতই বিশেষায়িত ও পৃথকীকৃত হোক না কেন, কোনও কাঠামোর সঙ্গে কোনও কাজের সম্পর্ক নিছক একটির সঙ্গে আর একটির (one-to-one) সম্পর্ক হতে পারে না।

সবশেষে, আমন্ড পরস্পরবিপরীত (Dichotomous) চিন্তাধারা বর্জন করেন এবং সব রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক ভাবে 'মিশ্র' চরিত্রে বিশ্বাস করেন। তাঁর যুক্তি হল, "রাজনৈতিক ব্যবস্থার জগতকে কোনও একটিই বৈপরীত্যের সাহায্যে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না (যেমন আধুনিক-প্রাচীন, উন্নত-অনুন্নত, শিল্প-কৃষি, পশ্চিমী-অ-পশ্চিমী) যদিও সাধারণত সেরকমই মনে করা হয়. "সঠিকভাবে পার্থক্যগুলি উপলব্ধি করতে ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে আমাদের প্রয়োজনে অদ্বৈত নয়, দ্বৈত মডেল এবং ক্রমবিকাশী (developmental) মডেলের সাথে সাথে সুস্থিতি বা ভারসাম্যের (equilibrium) মডেল।"

নিবেশ ও উৎপাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম (Input and output functions) : এখন আমরা আমন্ডের কাঠামোতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও প্রবেশন (Political socialization and recruitment) : রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি যথাক্রমে তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও কাঠামোগুলিকে সময়ের সাথে সাথে চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। এই চিরস্থায়ী করে রাখার প্রয়াস করা হয় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি-সদস্যদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ শুধুমাত্র ধারাবাহিকতা বজায় রাখার এক পন্থা নয়, পরিবর্তন আনারও এক পন্থা হতে পারে। এক নতুন বা রূপান্তরকামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও কাঠামোগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। পরিবার, ধর্মীয় কর্তৃত্ব, বিদ্যালয়, কর্ম গোষ্ঠী, স্বেচ্ছসেবী সংস্থা

ইত্যাদি সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার অন্তিম ফলাফল হল "রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তার বিভিন্ন ভূমিকা, তাদের কর্তব্যগুলির প্রতি এক গুচ্ছ মনোভাব—চেতনা (cognition), মূল্যবোধের আদর্শ ও অনুভূতি। এর মধ্যে আরও রয়েছে দাবির নিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, তাকে প্রভাবিত করে যে সব মূল্যেবোধ সেগুলি, তার প্রতি মনোভাব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাবি ও তার কর্তৃত্বপূর্ণ উৎপাদ।" সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রতীয়মান ও প্রচ্ছন্ন, দু ধরনেরই হতে পারে। সামাজিকীকরণের কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কাঠামোগুলির উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক গবেষণা যেভাবে এই কাজকর্ম করা হয়, সেই রীতিগুলির উপরেও গুরুত্ব দিতে পারে।

সামাজিকীকরণের কাজকর্ম যেখানে শেষ হয়, সেখানে আরম্ভ হয় রাজনৈতিক প্রবেশনের কাজ। প্রবেশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তি-সদস্যদের ভর্তি করে এবং তার বিশেষ বিশেষ ভূমিকাগুলিতে সদস্যদের দীক্ষাদান করে।

স্বার্থের উদাহরণ : এটি প্রকৃতপক্ষে সমাজকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ, স্বার্থ, দাবি, অধিকারের মত বিষয়গুলি সমাজের মধ্যে জন্ম নিলেও, সেগুলি মেটানোর জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করতে হয়। কাজেই স্বার্থ, দাবি, অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি এমনভাবে উচ্চারিত বা ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে সেগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিবেশে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণের কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও, এই উচ্চারণ বা ব্যক্ত করার কাজকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি পৃথক কাজ বলে মেনে নেওয়া উচিত। তুলনাবাদীরা জানতে আগ্রহী হবেন স্বার্থের বিষয়টি উচ্চারণ করার কাঠামোগুলির বিচারে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি কীভাবে একে অপরে থেকে পৃথক এবং কী কী ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে এই কাজটি করা হয়ে থাকে।

স্বার্থ উচ্চারণ বা ব্যক্ত করার প্রধান কাঠামো হল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি। আমন্ড চার ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন ঃ

(১) প্রতিষ্ঠান স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, (২) অ-সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (non-associational interest group), (৩) অ্যানোমিক বা স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (anomic interest group-'অ্যানোমিক' বলতে সমাজের এমন এক অবস্থা বোঝায় যেখানে আচরণ ও বিশ্বাসের আদর্শ মানগুলি দুর্বল বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থা পরিস্ফুট হয় তার বিভ্রান্তি, উদ্বেগ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে), (৪) সাংগঠনিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (associational interest groups)।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ন্বেষী গোষ্ঠীগুলি গঠিত হয় আইনসভা, নির্বাহী (executive), আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, গীর্জা ইত্যাদি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে। সেগুলি আইন প্রণয়নকারী জোট, প্রভাবশালী উপদেষ্টা গোষ্ঠী (kitchen cabinet), আবিষ্কার চক্র (officers, clique) ইত্যাদির আকার নিতে পারে।

দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ অ-সাংগঠনিক গোষ্ঠীগুলি জ্ঞাতিত্ব (kinship) এবং বংশগত সম্পর্ক অথবা জাতি (ethnic), জাত (caste) ও আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। এরা অনুপচারিতভাবে ও সবিরামভাবে (intermittently) কাজ করে এবং ব্যক্তিগত পরিচিতিগুলির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ ব্যক্ত করার চেষ্টা করে। অ্যানোমিক বা স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠীগুলি কিছুটা অস্থায়ী প্রকৃতির যারা বিক্ষোভ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও

এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থের কথা প্রকাশ করতে চায়।

সবশেষে সাংগঠনিক গোষ্ঠীগুলি হল "স্বার্থ উচ্চারণের বিশেষায়িত কাঠামো", যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী সংগঠন, মানবাধিকার গোষ্ঠী, কৃষক সংগঠন, নারী সংগঠন ইত্যাদি।

যদি তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয় ও স্বার্থ উচ্চরণের অন্যান্য কাঠামোগুলির সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তাহলে জাত, ভাষা বা জাতি-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলিকেও এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়

স্বার্থ ব্যক্ত করার বিভিন্ন কাঠামোগুলিকে আপেক্ষিক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বিচারে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। একই ভাবে, তাদের উচ্চারণের রীতিও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন প্রতীয়মান বা প্রচ্ছন্ন, নির্দিষ্ট বা বিক্ষিপ্ত, সাধারণ বা বিশেষ ইত্যাদি।

স্বার্থের সমষ্টিগঠন ঃ যদি অনেকগুলি স্বার্থের কথা উচ্চারণ করা হয়, তাহলে সেগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করার কোনও উপায় থাকা উচিত, যাতে এই স্বার্থগুলি বিকল্প নীতির রূপ নিতে পারে ও উৎপাদে রূপান্তরিত হবার কিছু সম্ভাবনা থাকে। এর থেকেই সমষ্টিগঠন ও কিছু সমষ্টিগঠনকারী কাঠামোর কাজকর্ম সম্পর্কে বোঝা যায়। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমষ্টিগঠনকারী কাঠামোর সবথেকে প্রতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টান্ত হল রাজনৈতিক দল। আমন্ড অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন যে বাস্তব জীবনে অন্যান্য অনেক কাজকর্মের মতই উচ্চারণ ও সমষ্টিগঠনের কাজগুলি অতিক্রমন (overlap) করে এবং এই কারণে স্বার্থের উচ্চারণের সঙ্গে শুধুমাত্র চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে যেমন এক করে দেখা উচিত নয়, তেমনই স্বার্থের সমষ্টিগঠনকেও শুধু রাজনৈতিক দলগুলির সাথে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। ধারণাগত ভাবে সমষ্টি গঠনের কাজকর্ম উচ্চারণের থেকে পৃথক ঃ প্রথমটি বোঝায় 'সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া' ও দ্বিতীয়টি স্বার্থের সংকীর্ণতার প্রকাশের জন্য সংরক্ষিত।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই দুইয়ের আপেক্ষিক প্রভেদ বা সমাপতনের উপর এবং একই সঙ্গে অনুরূপ কাঠামোগুলির উপর মনোযোগ দিতে পারে। একই ভাবে, দলগুলির কাঠামোর বিভিন্ন ধরন ও দিক তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য এক বিস্ফোরক বিষয় উপস্থাপিত করে।

রাজনৈতিক যোগাযোগ ঃ যোগাযোগ হল সেই উপায়, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্য সব কাজকর্ম—নিবেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদ ও সম্পাদন করে থাকে। একে সে ক্ষেত্রে একটি পৃথক কাজ হিসাবে দেখা নাও হতে পারে, কিন্তু অন্য সব কাজকর্মের এক অপরিহার্য দিক হিসাবেই শুরু মনে করা যেতে পারে। আমন্ড এই দ্বিধা সম্পর্কে সচেতন। তবুও দুটি কারণে তিনি একে পৃথক একটি কাজ হিসাবে দেখতে মনস্থ করেন ঃ প্রথমত, সমস্ত আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে যোগাযোগ মাধ্যমগুলি তাদের নিজস্ব পেশাদারি আচরণ বিধি নিয়ে এক বিশেষায়িত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমন্ড মনে করেন যে, "রাজনৈতিক যোগাযোগের কাজটিকে পৃথক করে নেওয়া ব্যর্থতা আমাদের একটি আবশ্যক উপকরণ থেকে বঞ্চিত করবে, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির পার্থক্য নির্দেশ করতে ও তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করতে খুবই প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণের যে প্রতিশ্রুতি এ দেয়, তার প্রলোভনই আমন্ডকে একে এক পৃথক কাজ

হিসাবে মনে করতে বাধ্য করেছে। অন্যান্য কাজকর্মগুলির মত এখানেও তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিভিন্ন ব্যব ার কাঠামো ও রীতিগুলির ওপর মনোনিবেশ করতে পারে।

সরকারি কাজকর্ম (বিধি প্রণয়ন, বিধি প্রয়োগ, বিধি সংক্রান্ত সীমাংসা বা রায়) ঃ Politics of Developing Areas গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের যে সব আঞ্চলিক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি নিবেশি কাজকর্মে বেশী ও সরকারি, অর্থাৎ উৎপাদ-সংক্রান্ত কাজকর্মে অনেক কম গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সরকারি কাজকর্ম, যেগুলি সম্পাদনের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিক সরকারি কাঠামোগুলির পশ্চিমী ব্যবস্থাগুলির তুলনায় সেগুলি অনেক অস্পষ্ট। এগুলি মূলত রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির আইন-সংক্রান্ত, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কাজকর্ম। পৃথকীকৃত কাঠামোগুলির মাধ্যমে কীভাবে এইসব কাজকর্ম বিশেষায়িত ও সম্পাদন করা হয়, তাদের কার্য সম্পাদনের রীতি এবং যে পদ্ধতির সাহায্যে সাংস্কৃতিক দ্বৈতবাদের (dualism) সমস্যার সমাধান করা হয় এই সবকটি বিষয়ই তুলনামূলক বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির শ্রেণিবিভাজন বা বর্গীকরণের উৎস হতে পারে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাবনাকে আমন্ড সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ "আমরা যা করেছি তা হল রাজনৈতিক কাজকর্মকে রাজনৈতিক কাঠামোর থেকে পৃথক করতে পেরেছি। অন্যভাবে বললে, আমরা কাজকর্ম ও কাঠামো, এই দুইয়েরই উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট করেছি এবং এই মত প্রকাশ করেছি যে, নির্দিষ্ট কাঠামোগুলির নির্দিষ্ট কাজকর্মের সাফল্য বা ব্যর্থতার সম্ভাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির তুলনা করা সম্ভব। শৈলীগুলি এছাড়াও, আমরা কাঠামোর সাহায্যে কার্য সম্পাদনের নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্তরকে এমন এক স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর করে তোলে, যার মধ্যে সম্ভাব্যতার বিবরণের (probability statement) আকারে আমরা কাজকর্ম, কাঠামো ও শৈলী, এই তিনেরই সঠিক তুলনা করতে পারি।"

জিবিক্সথাম পাওয়েল জুনিয়রের সঙ্গে তাঁর পরতবর্তী গ্রন্থ Comparative Politics : A Developmental Approach (1966)-তে আমন্ড তাঁর ব্যবহারিক কাঠামোতে আরও কয়েকটি নতুন দিক যোগ করেন। এই রচনাতে লেখকরা বলেন যে, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকগুলিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে দেখা যেতে পারে। একটি স্তরে আমাদের ব্যবস্থাটির সামর্থ্যের কথা বলতেই হবে। যে সামর্থ্য ব্যবস্থাটিকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে সাহায্য করে। এই ধরনের সার্মথ্যগুলি নিয়ন্ত্রণাত্মক (regulative), নিষ্কর্ষী (extractive), বন্টক (distributive) ও উত্তরসূচক (responsive)। দ্বিতীয় একটি স্তরে ব্যবস্থাটি এক রূপান্তর প্রক্রিয়ার (conversion process) মত কাজ করে। এটি ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ও এর মধ্যে আছে স্বার্থ উচ্চারণ ও সমষ্টিগঠনের কাজ, যোগাযোগ ও তিনটি সরকারি কাজ। সবশেষে ব্যবস্থাটির রক্ষণাবেক্ষণ ও অভিযোজনের কাজ আছে, সেগুলি সম্পাদন করা হয় সামাজিকীকরণ ও প্রবেশনের মাধ্যমে। এখানে আমন্ড তাঁর আগেকার রচনায় উল্লিখিত কাজকর্মগুলির পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করেছেন ও তাঁর কাঠামোতে ব্যবস্থা-পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের দিকটি যোগ করতে চেয়েছেন।

একটি মূল্যায়ন : সাধারণভাবে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার সঙ্গে এই বিষয়ে আমন্ডের সূত্র,

উভয়কেই প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ব্যবহারিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, চালু থাকা ও সমাকলনের উপর জোর দিয়ে ব্যবহারিকতাবাদীরা রক্ষণশীলতার প্রতি প পাতিত্ব দেখিয়েছেন। এটা বোঝানো হয়েছে যে, এই কাঠামো স্থিতাবস্থা (statusquo) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশী উপযোগী : রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরম বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা সমান উপযোগী নয়। মনে হয় স্থিতিশীলতা ও অস্তিত্ব বজায় রাখার বিষয়গুলিই যেন কাঠামোগত-ব্যবহারিক পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু।

অনে কই এই মতাদর্শগত সমালোচনা করলেও ফ্ল্যানিগান ও ফোগেলম্যান তাঁদের সঙ্গে একমত নন। এই দুজনের মতে, কাঠামোগত-ব্যবহারিকতাবাদীরা মনোযোগ দিয়েছেন আধুনিকীকরণের দিকে, যা যুদ্ধোত্তরকালে বেশির ভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থাই যে বিশালভাবে পরিব্যাপ্ত পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে, তারই অন্য এক নাম। তাঁরা দেখিয়েছেন যে কোনও প্রধান কাঠামোগত-ব্যবহারিকতাবাদী স্থি াবস্থার নামে আধুনিকীকরণকে প্রত্যাখ্যান করেননি।

আরও গুরুতর একটি সমস্যা হল এই যে, ব্যবহারিকতা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ বা টিকে থাকার বিষয়টি নিয়ে শুরু করলেও রক্ষণাবেক্ষণের কোনও মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দেয়নি। আমরা কখন বলতে পারব যে ব্যবস্থাটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে? নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাটির কিছু কাজ করা আবশ্যক কিন্তু যেহেতু সব ব্যবস্থাগুলি একাই কাজকর্ম করে থাকে, সব ব্যবস্থাগুলিই নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কোনও নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি না থাকায় গবেষকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব যে তাঁর গবেষণার বিষয় যে ব্যবস্থাটি, সেটি ঠিকমতো কাজ করেছ না কি করছে না।

Comparative Politics : A Developmental Approach গ্রন্থে আমন্ড কাঠামোকে "সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ভূমিকা" আখ্যা দিয়েছেন ও ভূমিকাকে বলেছেন "ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ"। কাঠামোর সংজ্ঞা নির্ণয়ে এটিও তেমন কাজে আসে না। ব্যবহারিকত র ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একটি কাজ, কিন্তু একে বলা হয় এক যার সাহায্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্তন করা যায়। কাজেই অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ ও প্রক্রিয়া সমার্থক কিনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক গতিশীলতাকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় যেহেতু তা কাঠামোগুলির আন্তঃসংযুক্তি ও আন্তঃনির্ভরতাকে উপেক্ষা করে। একটি কাঠামোর পরিবর্তন অন্যান্য কাঠামোগুলিকে, অথবা সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাটিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? এই প্রশ্নের উত্তরের কোনও সূত্র এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

লেভি, পারমনস, আমন্ড-প্রত্যেকেরই ব্যবহারিক বিশ্লেষণই হল এক ধরনের প্রয়োজনভিত্তিক বিশ্লেষণ (requisite analysis)। অর্থাৎ, টিকে থাকতে হলে কোনও ব্যবস্থার যে সব কাজকর্ম করা প্রয়োজন, তা সেগুলিকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সমস্যাটি হল, কতগুলি কাজকর্মকে আমরা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বলে মনে করব? কেউ দুটি, পাঁচটি অথবা পনেরটি এই ধরনের কাজকর্মের কথাও বলতে পারেন। ফ্ল্যানিগান ও ফোগেলম্যান যেমন বলেছেন ঃ এরকম মনে করার কোনও যুক্তি নেই যে কাজকর্মের একটি তালিকা, স্রেফ একটি তালিকাই প্রয়োজনীয় বলে ধরতে হবে। বিশ্লেষক তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে

"প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি" নির্ণয় করতে পারেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে ডেভিড ইস্টন একবার মন্তব্য করেছিলেন ঃ "পশুদের স্বভাব ওই রকমই। ওদের কেন দেখতে লাগছে তা বলা অত্যন্ত কঠিন।" মার্টন আবার মনে করেন যে, ব্যবহারিক তত্ত্বে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আজও সবথেকে অস্পষ্ট ও বিতর্কিত রয়ে গেছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব উপস্থাপিত করার লক্ষ্যে (যদি এটা তার আদৌ লক্ষ্য হয়ে থাকে) কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা সফল হয়নি। তবুও একটি বিশ্লেষণী ও অনুসন্ধানমূলক (heuristic) মডেল গঠন করতে তা সফল হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য তা এক শ্রেণীবিভাজন ি ত্তিক পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছে। এটি নির্দিষ্ট মানের শ্রেণীগুলির এক তালিকা পেশ করতে সক্ষম হয়েছে, যেগুলির সাহায্যে ব্যাপকভাবে ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির তুলনা ধরা সম্ভব হয়েছে। সিডনী ভার্বা মন্তব্য করেছেন : "ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ্য (appropriateness) সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে আমি শুধু বলতে চাই যে ব্যবহারিকতা কোনও সময়েই এক সর্বাত্মক ও আবদ্ধ (closed) তত্ত্ব ছিল না, বরং তা ছিল কয়েকটি শিথিল নির্দেশিকার সমষ্টি। সমালোচ করা একে যতখানি খারাপ বলছেন, ততখানি খারাপ এ কোনোদিন ছিল না।" আমন্ড নিজেও এ কথা স্বীকার করতেন ও সেই কারণেই তিনি তার প্রথম দিকের রচনাগুলির এক সংকলনের উপনাম (Subtitle) দিয়েছিলেন "Essays in Heuistic Theory"। এই উন্মুক্ত পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যই একাধারে ব্যবহারিকতার শক্তি ও দুর্বলতা।

৩.৫ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী

তুলনামূলক রাজনীতিতে সুসম্বন্ধ গবেষণাকে সাহায্য করার জন্য যদি কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা এক সুস্পষ্ট প্রয়াস হয়, তাহলে প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির (যার সঙ্গে ডেভিড ইস্টনের নাম অপরিহার্যভাবে জড়িত) প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি সম্পর্কে এক সাধারণ তাত্ত্বিক ধারণাশক্তি গড়ে তোলা। এর অর্থ, কাঠামোগত ব্যবহারিকতা যদি তুলনামূলক রাজনী তর কাছাকাছি হয়, তাহলে প্রক্রিয়া বিশ্লে ণের অবস্থান রাজনৈতিক তত্ত্বের অভ্যন্তরে। তবুও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মৌলিক স্বতঃসিদ্ধগুলি, রাজনীতির যে সংজ্ঞার উপর এ নির্ভরশীল, যে বক্তব্যগুলিকে এ সূত্রাকারে উপস্থাপিত করতে চায়, এ যে সব ধারণা ও ধারণাগত কাঠামো প্রদান করে এই সবই তাঁদের রচনাগুলির সংগঠন, ব্যাখ্যা ও সমৃদ্ধিকরণে তুলনাবাদীদের প্রচুর সহায়তা করবে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্পষ্ট আখ্যা দিয়ে তার থেকে নিজের রচনাকে ইস্টন কঠোরভাবে আলাদা করে রেখেছেন। যেমন A Framework for Political Analysis গ্রন্থে তিনি বলেন : "অপরিবর্তনীয় কাজগুলি সম্পাদনের জন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি, কাঠামোগুলির পরিবর্তনযোগ্যতা স্বীকার করে নিয়ে এবং বিভিন্ন কাঠামোর তুলনা করে আমরা তথ্যের মধ্যে কিছুটা তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করতে পারি। বৈজ্ঞানিক বিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গি যতই বৈধ হোক না কেন, এ কথা এখন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে তাত্ত্বিক বিচারে তা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। এর সবথেকে খারাপ দিক হল এই যে, এ গবেষকদের এক বিশাল সংখ্যার খেলায় জড়িয়ে দেয় যার কোনো শেষ নেই : প্রতিটি গবেষককে তাঁর পছন্দমত সংখ্যার

অপরিবর্তনীয় কাজকর্মগুলি নির্দিষ্ট করতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং বিকল্পগুলির মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার কোনও সন্তোষজনক পদ্ধতি নেই।"

তবুও ইস্টন কাজকর্ম বা কৃত্যকে তাঁর মুখ্য বিষয় মনে করেন যখন ও A Systems Analysis of Political Life গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেন : "এখানে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজার চেষ্টা করেছি রাজনৈতিক ব্যবস্থার যাকে বলা যেতে পারে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াগুলিকে (life process), সেই ধরনের কাজকর্মগুলিকে যাদের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তোলে।"

সম্ভবত এই কারণেই কখনও কখনও বিল ও হার্ডগ্রেভের মতো কেউ কেউ এই মত প্রকাশ করেন যে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। বাস্তবে অবশ্য এ কথা সত্যি নয়। কাঠামোগত-ব্যবহারিকতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থার টিকে থাকার বিষয়টিকে স্বীকৃত নিয়ম বা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হলেও, প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ বিষয়টিকে সমস্যামূলক মনে করে।" এ যে মৌলিক প্রশ্নটি তোলে সেটি হল অবিরাম চাপের মুখে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি কীভাবে টিকে থাকতে সক্ষম হয় ? কী অবস্থায় এগুলি আর টিকে থাকতে পারবে না ?

এছাড়াও, কাঠামোগত-ব্যবহারিকতার পথে না গিয়ে প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ টিকে থাকার এক স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করে এবং ফলে কোনও ব্যবস্থা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কখন করা হয়, সেই বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর ও আরও ভালভাবে দিতে পারে। রাজনীতির যে সংজ্ঞার উপর এ নির্ভরশীল, যথা "কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (values) বন্টন সেই সংজ্ঞাটিকে টিকে থাকা সম্পর্কে এই ধরনের এক সঠিক মত গঠনে সাহায্য করে। সহজভাবে বললে, একটি ব্যবস্থা টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়, যখন কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে সমাজের জন্য সামগ্রী আর প্রাপ্তিযোগ্য থাকে না। কিন্তু খুবই বাস্তবসম্মতভাবে টিকে থাকা টিকে না থাকাকে এ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের দুটি দিক বলে মনে করে না। প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ বরং টিকে থাকা টিকে না থাকাকে সদৃশ বিষয়গুলির এক ধারাবাহিক সারির (contimun) মধ্যে দুটি বিন্দু বলে মনে করে, যাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির (critical variables) 'স্বাভাবিক প্রান্তসীমা' (normal range) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য অনেক পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে সেগুলি অপ্রয়োজনীয়। আমাদের এটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা ও প্র য়া বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতাবাদী ঐতিহ্যের মধ্যেই দটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইস্টনকে শুধু সেই অর্থেই ব্যবহারিকতাবাদী বলা যায় যে অর্থে আমরা সকলেই ব্যবহারিকতাবাদী।

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণকে প্রায়শই যে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় তা হল যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বিবেচনার মধ্যে আনে না। এই সমালোচনা খানিকটা অযৌক্তিক, যেহেতু প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ টিকে থাকার বিষয়টিকে তার সম া বলেই মনে করে। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, বেশীরভাগ সময়েই মানবসমাজ কোনও না কোনও ধরনের কর্তৃত্বব্যঞ্জক সামগ্রী বন্টনকে সংগঠিত করে। আমাদের চারদিকে অবিরাম এত পরিবর্তন ঘটতে থাকা সত্ত্বেও তা কীভাবে সম্ভব, তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ নিজের হাতে তুলে নেয়। বিপ্লব বা অন্য কিছুর জন্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা যদি এই

দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল করে দিত, তাহলে এটি তার দুর্বলতা বলেই গণ্য করা হত। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি এরকম কিছু করেনি।

সবশেষে প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ সম্পর্কে আর একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয় যখন আমরা তাকে এক 'প্যারাডাউম' (paradigm) হিসাবে দেখি। হাল্ট এবং রিচার্ডসন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণকে এক 'প্যারাডাইম' হিসাবে উল্লেখ করেন ও তাকে যথেষ্ট আক্রমণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ইস্টনের কাঠামো প্যারাডাইম-এর মৌলিক শর্তগুলিই পূরণ করে না। 'প্যারাডাইম' নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত একটি কঠোর শব্দ, টমাস কাহন তাঁর The Structure of Scientific Revolutions গ্রন্থে যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ইস্টন কোনও সময়েই তাঁর কাজকে 'প্যারাডাইম' বলে উল্লেখ করেননি। তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ World Politics (1970)-এ তিনি বলেন ঃ "আমি এখানে এক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করতে চাই, যা খুব কম হলেও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সম্পর্কে আলোচনার প্রেরণা যোগাবে এবং খুব হলে এক সাধারণ রাজনৈতিক তত্ত্বের দিকে একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে।"

A Framework for Political Analysis গ্রন্থে তিনি বলেন : "এই গ্রন্থে আমি যুক্তির মাধ্যমে সংহত এক গুচ্ছ বর্গ (category) গড়ে তুলতে চেয়েছি, যা অভিজ্ঞতাবাদের বিচারে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও যা এক আচরণের প্রণালী হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের বিশ্লেষণ সম্ভব করে তুলবে।"

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ A Systems Analysis of Political Life সম্পর্কে তিনি বলেন : "এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একটি ধারণাগত কাঠামোর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া এবং যেখানে সম্ভব, সেখানে কিছু তাত্ত্বিক বক্তব্যের প্রস্তাব সামনে রাখা.....এক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ক সংহত চিত্র উপস্থাপিত করা।"

'প্যারাডাইম' দূরের কথা, ইস্টন স্পষ্টই তাঁর রচনাকে 'তত্ত্ব' আখ্যা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ-কাঠামো রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হয় সমাজের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়াগুলির সাহায্যে। রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়া হল সেই ধরনের কাজকর্ম, যা সমাজের জন্য গৃহীত কর্তৃত্বব্যঞ্জক নীতি ও সেটিকে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে—এই দুই বিষয়কেই গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অন্যভাবে বললে, মানবিক আন্তঃক্রিয়া তখনই রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, যখন তা সমাজের জন্য কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে বন্টন-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে।

অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির মত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এক মানসিক নির্মাণ। অর্থাৎ, কোনও সমাজেই মরা রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়াগুলিকে ব্যাহ্যিকভাবে (physically) সংহত দেখি না। তা দেখা সম্ভব শুধুমাত্র আমাদের মনে চোখ দিয়ে।

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ চারটি সূত্রের উপর নির্ভরশীল : (১) প্রক্রিয়া (system) : রাজনৈতিক জীবনকে এক আচরণ প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা সুবিধাজনক। অন্যভাবে প্রকাশ করলে, রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়াগুলি যেখানে, যে আকারে, যাদের মধ্যেই (ব্যক্তি/গোষ্ঠী) ঘটুক না কেন, এটা বেশ কার্যকররূপে ধরে নেওয়া যায় যে তারা কোনও না কোনওভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সুতরাং তারা এক সমগ্রের অংশ।

(২) পারিপার্শ্বিক (environment) রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে ধারণা আমরা গঠন করেছি, সেই অনুযায়ী তা কোনও শূন্যতার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থা এক পারিপার্শ্বি মধ্যে প্রোথিত আছে, যা একই সমাজের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থা (অভ্যন্তরীণ, পারিপার্শ্বিক) এবং অন্যান্য সমাজের সবকটি ব্যবস্থা (বহিঃস্থ, পারিপার্শ্বিক) নিয়ে গঠিত।

(৩) প্রতিক্রিয়া (response) : পারিপার্শ্বিকের কাছে উন্মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পারিপার্শ্বিক ও নিজেরই ভিতর থেকে আসা চাপের মোকাবিলা করতেই হয়। এই চাপ সামলানো বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তন ঘটায়।

(৪) সাড়া (feedback) : এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ও অন্যান্য প্রভাবগুলি সম্পর্কে তথ্য ব্যবস্থার কাছে ফিরে আসে। প্রকৃতপক্ষে কোনও ব্যবস্থার টিকে থাকার ক্ষমতা এই ফিরে আসা তথ্য ও তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

সুতরাং যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়াগুলি এক উন্মুক্ত ব্যবস্থা গঠন করে, যা তার চারপাশের ও নিজের ভিতরের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে। এ টিকে থাকার সামর্থ্য আহরণ করে মোকাবিলা করার ক্ষমতা থাকে, যাকে শক্তি যোগায় সাড়া পাবার প্রক্রিয়া (feedback process)। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে তা অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি পরীক্ষা করতে পারে এবং ভবিষ্যতের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে পারে। কাজেই এটি হল এক লক্ষ্য-নির্ধারক (goal-setting), লক্ষ্য-পরিবর্তনকারী (goal modifying) ও আত্ম-রূপান্তরকারী (self-transforming) ব্যবস্থা।

নিবেশ ও উৎপাদ : আমাদের কিছু কিছু চাহিদা ও ইচ্ছা আমরা ব্যক্তিগত চেষ্টায় বা অন্যদের সাথে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের অনেক চাহিদা বা ইচ্ছা (সামাজিক চাহিদা) এই ভাবে পূরণ করা যায় না, কারণ তা নির্ভর করে যে সব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর (values) যোগান কম, সেগুলির লভ্যতার (avalability) উপর। এর ফলে সমাজে প্রতিযোগিতা ও বিবাদের জ হয় এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সেই প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির কর্তৃত্বব্যঞ্জক বন্টনের প্রয়োজন হয়। যাতে সমাজ ধ্বংসের মুখোমুখি বা ধ্বংস না হয়।

সমাজে কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টনের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে জড়িত এই সব মানবিক আন্ত-ক্রিয়া, অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা তখন সামাজিক চাহিদাগুলির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম নেওয়া সামাজিক চাহিদাগুলি যখন সেগুলি পূরণের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়, তখন তাদের দাবির নিবেশ (inputs of demand) বলা হয়। সামাজিক চাহিদাগুলি এক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাবির নিবেশে পরিণত হয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি চালু করে রাজনৈতিক গোষ্ঠী, দল, গণমাধ্যমে ও এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যারা সামাজিক চাহিদাকে রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত করতে সাহায্য করে এবং তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থাপন করে।

'পারিপার্শ্বিক' রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছে শুধুমাত্র দাবিই পেশ করে না, তা ব্যবস্থাকে সমর্থনও যোগায়। একে বলা হয় 'সমর্থনের নিবেশ' (input of support)। এই সমর্থন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি অঙ্গ, যথা কর্তৃপক্ষ, সরকার ও গোষ্ঠী বা সমাজকে পৃথকভাবে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সর্বোপরি, এই সমর্থন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক কর্তব্য, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কর্তৃত্বব্যঞ্জক বন্টন প্রক্রিয়াটিকে দিতেই হবে। সমর্থনের নিবেশ নির্দিষ্ট হতে পারে। যার ফলে তা পর্যবেক্ষণযোগ্য। আবার তা বিক্ষিপ্তও

হতে পারে, অর্থাৎ সমাজের মধ্যে তা এক সমর্থনমূলক ভাবাবেগ হিসাবেও ছড়িয়ে থাকতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ হল এমনভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্টন করা, যাতে দাবির নিবেশে সাড়া দেওয়া হয় ও তাকে কমানো হয় এবং অন্যদিকে সমর্থনের নিবেশকে বজায় রাখা হয় ও আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়। ব্যবস্থা এই কাজটি সম্পাদন করে উৎপাদনের মাধ্যমে এবং ফিডব্যাক (সাড়া) প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে উৎপাদের ফলাফল বা পরিণতি সম্পর্কে সংবেদনশীল থেকে। একে এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

সারণি ৩.২

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী মডেল (Systems analytic model)

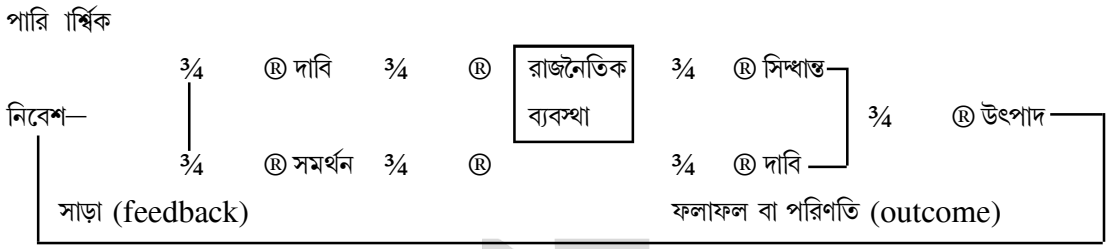

উৎস : A Framework for Political Analsysis. P. 12

টিকে থাকার সমস্যা : বিশ্বের অন্য সব কিছুর যতই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও নিত্য পরিবর্তনশীল। কখনও কখনও এই পরিবর্তনশীল ব্যাপক ও নাটকীয়। আবার কখনও কখনও সেগুলি ক্ষুদ্র ও বাঁধাঁধরা। এই পরিবর্তনগুলি টিকে থাকার সঙ্গে অনিবার্যভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রকৃতপক্ষে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সময়য়োচিত পরিবর্তন বা কাঠামো বিন্যাসের পরিবর্তন বা লক্ষ্যের পরিবর্তন ব্যবস্থাটির টিকে থাকার ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাহলে টিকে থাকার সমস্যাটি কীভাবে দেখা দেয় ? প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের ভা ায়, টিকে থাকা হল ভেঙে পড়া বা দুর্বল হয়ে পড়ার

উপক্রম হয়। কিন্তু কখন আমরা বলতে পারি যে ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ার মুখে ? তা বলা যায় যখন ব্যবস্থাটি তার মৌলিক কর্তব্য, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্টনে ব্যর্থ হয় ও সমাজে এই ধরনের বন্টনকে মেনে নেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে বিফল হয়।

কোন ব্যবস্থা প্রকৃতই ভেঙে পড়ে কী হবে, প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। এর চিন্তার বিষয় হল কোনও ব্যবস্থা কীভাবে টিকে থাকতে পারে বা ভাঙন এড়াতে পারে। এখানে চাপের ধারণাটি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক থেকে প্রভাবগুলি (যাদের 'disturbance' বা বিশৃঙ্খলা বলা হয়, অর্থাৎ পারিপাশ্বির্কের মধ্যেকার ঘটনা) অবিরত ব্যবস্থাটির মধ্যে ঢুকে পড়ে, যাদের মধ্যে কয়েকটি চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁতভাবে কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টনের কাজটি সম্পাদন করতে পারে না। কোনো কোনো সময় এটি অন্যান্য সময়ের তুলনায় ভালভাবে সম্পাদিত হয়, কোনো কোনো ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থার থেকে আরও ভালভাবে এই

কাজটি করতে পারে। এর অর্থ হল এই যে, একটি 'স্বাভাবিক প্রান্তসীমা' আছে যার মধ্যে এই সামগ্রী বন্টনের কাজটি করা আবশ্য। কোনও পারিপার্শ্বিক প্রভাব তখন চাপ সৃষ্টি করেতে পারে, যখন তা কত-ৃত্বব্যঞ্জকভাবে সামগ্রী বন্টনের কাজটিকে তার স্বাভাবিক প্রান্তসীমা (অর্থাৎ সহনীয়) থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে যাতে এই বন্টন আর সম্ভব হয় না বা এই বন্টন সমাজে স্বীকৃত হয় না।

চাপের নানান উৎস থাকতে পারে। যেমন, দাবির নিবেশ চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যদি ব্যবস্থার কাছে অনেক দাবি পেশ করা হয় (দাবির মাত্রাতিরিক্ত বোঝা) বা উৎপাদ সেই দাবিগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় (উৎপাদের ব্যর্থতা)। সমর্থন হারালেও ব্যবস্থা চাপের মুখে পড়তে পারে। এদের যথাক্রমে 'দাবির চাপ' (demand stress) ও সমর্থনের চাপ (support stress) বলা হয়।

এই দুই ব্যবস্থাতেই চাপ যদি ব্যবস্থাকে একেবারে পর্যুদস্ত না করতে পারে, তাহলে দাবির চাপ এবং অথবা সমর্থনের চাপ সামলানোর বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন, কোনও কার্যকর রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থা দাবির মাত্রাতিরিক্ত বোঝাকে লঘু করতে পারে। তা আরও কার্যকরভাবে পরিবর্তনশীল উৎপাদকে কাজে লাগাতে পারে।

এক কার্যকরী 'ফিডব্যাক' প্রক্রিয়া কোনও ব্যবস্থাকে তার অতীতের দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করতে পারে ও আত্ম-সংশোধনের অঙ্গ হিসাবে কর্মচারী পরিবর্তন ও কাঠামো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাটি ভবিষ্যতে উন্নততর ফালফলের জন্ম দিতে পারে। উৎপাদনের গুণমান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে তা সমর্থন বাড়াতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গো র পুনর্বিন্যাস করে (যেমন 'ভেলভেট হ্যান্ডশেক', অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়াকে চেক ও শ্লোভাক রিপাবলিকে ভাগ করে দেওয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্বিন্যাস) দাবির চাপ কমানো ও সমর্থনের উৎস বাড়া া যেতে পারে।

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী নির্মাণে টিকে থাকা তাই আত্ম-রক্ষণাবেক্ষণেতা চেয়ে অধিক কিছু। চাপের মুখে ি তিস্থাপকতা (resilience) দাবি করে। অভ্যন্তরীণ চাপ ও পারিপাশ্বি র চাপ, এই দুই চাপকে সামলানোর ক্ষমতা ব্যবস্থাকে অর্জন করতেই হবে। সামলানোর এই ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব, যদি ব্যবস্থাটি তার পরিধি, সদস্যপদ, কাঠামো ও প্রক্রিয়া, লক্ষ্য বা আচরণবিধি সম্পর্কে যখনই প্রয়োজন তখনই যথেষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

এখানে আমরা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী কাঠামোটিকে খুব সরলভাবে ও সংক্ষেপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। এই মডেলটি বাস্তবে আরও অনেক জটিল। ইস্টন তাঁর A Systems Analysis of Political Life গ্রন্থে একে বিশদভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ও তুলনামলূক রাজনীতি : প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এই যে তা রাজনীতির ছড়িয়ে থাকা তথ্যগুলিকে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ আকৃতি দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও সংযোগহীন ঘটনাগুলি মনে হয় যেমন এক সম্পূর্ণ সমগ্রের (whole) গঠন করেছে। বিল ও হার্ডগ্রেভ যেমন দেখিয়েছেন যে, "প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণকে রাজনৈতিক জীবন ও সমগ্র সমাজব্যবস্থার (রাজনৈতিক জীবন যার একটি অঙ্গ) জটিল আন্তঃসম্পর্কের প্রতি সংবেদী করে তুলেছে। এ রাজনৈতিক

ঘটনাগুলিকে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এক আচরণ ব্যবস্থা হিসাবে দেখিয়েছে, নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করেছে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের উপর, যা তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি বা গঠনকারী উপাদানগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্যই মডেলটির জটিলতা ও এর উপস্থাপিত বহু ধারণা একে সন্তোষজনকভাবে কাজে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মডেলটির এক বায়বীয় (ethereal) ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত সামান্যীকরণের দাবি মেটাতে গিয়ে বিষয়বস্তুকেই লঘু করে ফেলা হয়েছে। অবশ্য এটা হয়তো একটা অনিবার্য ঘটনা।

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণী কাঠামো রাজনীতির সামান্যকৃত ধারণা সৃষ্টি করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা সীমিত রয়ে গেছে। এ কথা সত্যি যে প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গির দেওয়া রাজনীতির চিত্র, এর দ্বারা উপস্থাপিত বিভিন্ন রকমের ধারণা ও তাদের মধ্যেকার যোগসূত্রগুলি অভিজ্ঞতাবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু বিল এবং হার্ডগ্রেভের মতে, আমন্ডের কাজের মত না হয়ে এ "তুলনামূলক রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার" উপর খুব অল্পই প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। কারণ এক দিকে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা বোঝার জন্য এটি এক জটিল মডেল। এই কাঠামোর উপস্থাপিত সমগ্র জটিলতার কথা বিচার করলে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির তুলনা করা প্রায় অসম্ভব। এটি আবার খুব চিত্তাকর্ষক নাও হতে পারে, কারণ দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে টিকে থাকতে সক্ষম হয় তার অনেকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এই ব্যাখ্যাগুলিকে খন্ডন করাও যায় না, আবার বৈধতাও দেওয়া যায় না।

তুলনা করার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগিতা সম্পর্কে আর একটি যে সমস্যা দেখা দেয় তা হল, ব্যবস্থার টিকে থাকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার একটি সাধারণ মডেল গঠন করতে গিয়ে তা টিকে থাকার সবকটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ও কর্মরত প্রক্রিয়াগুলির সাদৃশ্যের উপর জোর দিয়েছে। শুধুমাত্র সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় তা তুলনামূলক অনুসন্ধানের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, উভয়ের উভয়েরই উপর গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। টিকে থাকা সবকটি ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান অনিবার্যভাবে আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে যে এই ব্যবস্থাগুলি কোনও না কোনও উপায়ে চাপসৃষ্টিকারী পরিস্থিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সফল হয়েছে। সুতরাং তুলনামূলক গবেষণা একটা ছকের মধ্যে পড়ে যাবে। বিভিন্ন সময় বিন্দুতে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির ভিতরে ব্যবস্থায় কর্মরত কাঠামোর অংশগুলির উপর মনোনিবেশ করে সম্ভবত আরও আকর্ষণীয় তুলনার প্রয়াস করা যেতে পারে। কাজেই সমগ্র কাঠামোটিকে মনে রেখে রূপান্তর প্রক্রিয়া বা বিভিন্ন ব্যবস্থায় দাবির চাপ বা সমর্থনের চাপের প্রতিক্রিয়াগুলির তুলনা করা যেতে পারে। তুলনা করার সময় কাঠামোটিকে মনে রাখলে সম্ভাব্য অনেকগুলি যোগসূত্রের অনুসন্ধানে সুবিধা হয় এবং একই সময়ে এর আবদ্ধকর (straitjacket) প্রভাবকে এড়ানো যায়।

৩.৬ তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ : সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও বিশেষভাবে তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে কাঠামোগত ব্যবহারিকতা ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আচরনবিধি সংক্রান্ত বিশ্বাসের

(behavioural persuasion) মধ্যে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব প্রাক আচরণবিধির যুগে। ইস্টন বলেন যে, এর জন্ম কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর এই বিশ্বাস থেকে যে "রাজনৈতিক জীবনকে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা যায় যদি আমরা নীতির উপর প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাবকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করি।" যে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতির উদ্ভব ও তাকে আকৃতি দিয়েছে যে সব প্রভাব, সেগুলিকে সেই সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে স্থাপন করা যায়, তাদের সাধারণত 'সনাতনপন্থী' বা 'প্রতিষ্ঠানপন্থী' আখ্যা দেওয়া হয়। এই গোষ্ঠীর মতে, নীতিকে রূপ দেয় যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা ক্ষমতার যে ধরন, তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেই পরিস্থিতিতে কাজ করা মানুষেরা নয়।

উনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠানপন্থীরা মনোযোগ দিয়েছিলেন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে, অর্থাৎ সেই সব প্রতিষ্ঠান, যাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ও আইনানুসারে আনুষ্ঠানিক নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণের ভার দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিকে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক-আইনি ভাষায় বর্ণনা করা হত। পরবর্তীকালে এতে এক বাস্তবধর্মী মাত্রা যোগ করা হয়, যখন এই সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কাজকর্মকেও অনুসন্ধানের আওতায় আনা হয়। আরও পরে, প্রতিষ্ঠানপন্থীরা তাদের অনুসন্ধানকে আরও বিস্তৃত করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেও তাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেন যেখানে অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন সংগঠিত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা অসংগঠিত সামাজিক শক্তি, যেমন শ্রেণী, ধর্মীয় বা জাতি গোষ্ঠীগুলি ক্রিয়াশীল।

কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যদিও আমন্ড ও ইস্টনের মত কিছু একক পণ্ডিতের নাম জড়িয়ে আছে, সেখানে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দীর্ঘ সময় জুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁদের অবদান রেখেছেন। শুরুর দিকের আইন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাথমিকভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বেনথাম ও ইংরেজ উপযোগিতাবাদীরা। সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক হিসাবে আইনের উপর তাঁদের গভীর আস্থা ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে একটি শক্তিশালী আইন ব্যবস্থা গঠন করতে পারলে প্রত্যাশামূলক ফল হতে বাধ্য। "প্রতিষ্ঠানগুলিকে পালটে দাও, মানুষ ঠিক অনুসরণ করবে," এই ছিল তাঁদের নীতিকথন (aphorism)। একই ভাবে, মার্কিন প্রতিষ্ঠানপন্থীরা মনে করতেন যে, রাজনৈতিক জীবনে মানুষ কীভাবে তার চিন্তাভাবনাকে কাজে রূপ দেয় সংবিধানই তা প্রকৃত নির্ণয় করতে পারে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে রাজনৈতিক জীবনের গবেষকরা উপলব্ধি করেন যে সংবিধানের আইন সংস্থানগুলি সেগুলি বাস্তবে কীভাবে কাজ করে তা ঠিক বর্ণনা করেনি। কার্যক্ষেত্রে আইন সংস্থানগুলিকে ঘিরে বহু ধরনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণে যাদের ভূমিকাই সম্ভবত বেশি ছিল। কঠোর আইন বর্ণনা থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে সরিয়ে আনার এই মতকে ইস্টন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গবেষণায় 'বাস্তববাদের পর্যায়' (Phase of realism) বলে অভিহিত করেছেন।

এই 'বাস্তববাদ', যা অতলান্তিক মহাসাগরের দুই প্রান্তের গবেষকদের মধ্যেই লক্ষণীয় ছিল, তা প্রকৃত পক্ষে এক সামাজিক অস্থিরতার পরিণাম ছিল, শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থনৈতিক দোদুল্যমানতা ও শিল্পায়ন

এবং দ্রুত নগরায়নজনিত সমস্যার সৃষ্টি যে অস্থিরতার মুখোমুখি হয়েছিল পশ্চিমী বিশ্ব। বাস্তবজীবনের রাজনীতি আইনি বিধির দ্বারা প্রত্যাশিত রাজনীতি থেকে অনেক পৃথক ছিল। উডরো উইলসন হলেন প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যিনি প্রতিষ্ঠানপন্থীদের আইন-সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সংবিধানের 'কাগুজে বর্ণনা' (Paper distribution) ও এক 'জীবন্ত বাস্তব' (living reality) হিসাবে সংবিধানের পার্থক্য নির্দেশের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন ইংল্যান্ডের ওয়াল্টার বেজটে। ইস্টনের কথায়, বেজহট "আইনি কর্তাদের প্রকৃত অবস্থান ও সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস আবিষ্কার করতে আগ্রহী ছিলেন।" একইভাবে, তাঁর American Commonwealth গ্রন্থে জেমস ব্রাইস আইনি বর্ণনার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিলেও ওয়াশিংটন ও অন্যান্য রাজ্যের রাজধানীগুলিতে নীতি প্রণয়নের উপর দল (প্রায় একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান) ও জনমতের প্রভাবকে উপেক্ষা করেননি।

বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারণাটি ক্রমশ গড়ে ওঠে। এর মতে, রাজনৈতিক জীবন চিহ্নিত হয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অবিরাম আন্তঃক্রিয়া দ্বারা। এর যুক্তি হল, রাজনৈতিক জীবনকে বুঝতে এই সব গোষ্ঠী, বিশেষত চাপসৃষ্টিকারী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করা আবশ্যক। এই মত এই শতকের প্রথম দিকে রাজনীতি গবেষকদের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান : সরল ও সমজাতীয় সমাজগুলির ভিত্তি হল একক সামাজিক শক্তিগুলি। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে শ্রেণীই একমাত্র সামাজিক শক্তি। একইভাবে, কোনও সমাজের সকলেই কৃষিজীবী হলে কৃষকশ্রেণীই হল একমাত্র বা সবথেকে প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের সমাজে সামাজিক শক্তিগুলির আন্তঃক্রিয়া বা বিবাদ নেই বললেই চলে। অন্য দিকে, সমাজ যত জটিল ও ভিন্নজাতীয় হয়ে ওঠে, তখন জাতি, ধর্ম, ভাষা, এলাকা, অর্থনৈতিক ও মর্যাদার চিহ্ন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বহু বিবদমান সামাজিক শক্তি গড়ে ওঠে। সামাজিক শক্তিগুলির এই প্রতিযোগিতামূলক ও বিবদমান আন্তঃক্রিয়াগুলি রাজনীতির কাঁচা মাল হলেও, সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত বা প্রশমিত না করতে পারলে এই বিবাদগুলি সমাজে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের কাজটি করা হয় রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যক্রম অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক স্যামুয়েল হান্টিংটন এই দৃষ্টিতেই দেখেন।

তাঁর মতে 'রাজনৈতিক গোষ্ঠী'-র (Political community) ভূমিকা হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। সিসেরোর কথা উল্লেখ করে হান্টিংটন দেখান যে, রাজনৈতিক গোষ্ঠী বলতে বোঝায় এক 'সাধারণ ঐকমত্যের' ভিত্তিতে 'পারস্পরিক সুবিধা' অর্জন করতে যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষের (এবং নারীর) একত্রিত হওয়া। রাজনৈতিক গোষ্ঠীর এই হল দুটি দিক। কিন্তু এর আবার একটি তৃতীয় দিকও আছে। এবং সেটি হল যে, রাজনৈতিক গোষ্ঠী শুধুমাত্র 'একত্রিত হওয়া' নয়—বরং 'নিয়মিত, স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্নভাবে একত্রিত হওয়া'। জনতা ও এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পার্থক্য এখানেই। সামাজিক শক্তিগুলির আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যম যে সব সংগঠন ও কার্যক্রম তাদের প্রতিষ্ঠানীকরণ থেকেই রাজনৈতিক গোষ্ঠী এই চরিত্রটি আহরণ করে। হান্টিংটনের ভাষায় একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা কার্যক্রম.....হল শৃঙ্খলা রক্ষা, বিবাদের সমাধান,

কর্তৃত্বসম্পন্ন নেতা নির্বাচন ও দুই বা তারও বেশি সামাজিক শক্তির মধ্যে গোষ্ঠীভাব জাগিয়ে তোলার এক ব্যবস্থা।"

কোনও কিছু করার জন্য প্রতিষ্ঠান হল এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত উপায়। এই ভাবে দেখলে বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বিপরীত লিঙ্গের দুটি মানুষ স্থায়ী ও সমাজের দ্বারা স্বীকৃত উপায়ে একত্রে বাস করেন। একইভাবে, শাসক বেছে নেওয়ার এক প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে নির্বাচন এক প্রতিষ্ঠান। মতানৈক্যগুলিকে ছাঁচে ফেলা, গোষ্ঠীভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম এমন কিছু ব্যবস্থার সাহায্যে বিবাদের সমাধান করা বা বিশেষ কিছু কাজকর্মকে উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাংগঠনিক উপায়ের রূপ নিতে পারে। এইভাবে বিচার করলে আইনসভা, রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয়—এগুলি সবই এক একটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, হান্টিংটন যেমন বলেছে, প্রতিষ্ঠান হল "স্থায়ী, গুরুত্বপূর্ণ (valued), পুনরাবৃত্ত আচরনের ধরন।"

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা গুলির অবস্থান সামাজিক শক্তি ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির মাঝখানে। বিবদমান সামাজিক শক্তিগুলির ভিন্নতা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলি এক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্ভাব্য করে তোলে। সমাজ যত বেশী জটিল হয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তত বেশী বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিবাদের ফলে সমাজ যদি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাহলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও আর অস্তিত্ব থাকবে না। হান্টিংটন বলেন, "সামাজিক বিবাদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, আর সামাজিক সমন্বয়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সেগুলি অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যায়।" এর অর্থ তাহলে এই দাঁড়ায় যে, সমাজে বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তার মৌলিক সামাজিক সমন্বয় ও রাজনৈতিক স্থিরতার সূচক।

প্রতিষ্ঠানপন্থা ও তুলনামূলক রাজনীতি : সমাজ ও শাসনব্যবস্থার মাঝের বিস্তৃত পরিসরে নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থান। সুপরিচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে সরকারের বিভাগগুলি, যথা আইনসভা (Legislature), প্রশাসন বিভাগ (executive) ও বিচারবিভাগ (judiciary)। এগুলি হল বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেগুলি তাদের গঠনতন্ত্র, ক্ষমতা ও কার্যক্রম আহরণ করেছে সংবিধান বা মৌলিক আইন থেকে। তবুও, শুধুমাত্র আইনি কার্যবিধিগুলির মাধ্যমে এদের সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, কারণ প্রায়-সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন রাজনৈতিক দল ও প্রায়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী তাদের ঘিরে প্রভাব সম্পর্কের (influence-relation) এক জাল বিস্তার করে। এই প্রভাব-সম্পর্কগুলি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যায়।

এ কথা অবশ্য ঠিক নয় যে, প্রায়-সরকারি ও প্রায়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সংবিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আইনি কার্যবিধির বাইরে কাজ করে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যত নীচের দিকে যাওয়া যায়, সংবিধানের উপর প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ভরতা বা অন্যভাবে বললে, প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। (সারণি ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। সংবিধান নিজেই এক প্রতিষ্ঠান, একেবারে মৌলিক বা ব্যাপক প্রভাবশালী (overarching) ধরনের। সংবিধানই শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরে অন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিগুলি স্থির করে। তবুও সংবিধান কোনও অপরিবর্তনশীল বা অপরিবর্তনীয় প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া ও সাধারণ সামাজিক রদবদলগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মত সংবিধানেরও পরিবর্তন ঘটায়।

সারণি ৩.৩

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজ

সংবিধান ¾ ® সরকারি ¾ ® সিদ্ধান্ত/নীতি নির্ধারণ

আইনি কার্যবিধি প্রতিষ্ঠান ঃ

আইনসভা, প্রশাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন

কমিশন, জনপালনকৃত্যক (civil service)

– –

প্রায়-সরকারি প্রতিষ্ঠান ঃ

(near-governmental institutions)

রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- -

প্রায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান

(near-societal institutions)

স্বার্থান্বেষী/চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি

সমাজ ঃ সামাজিক শক্তি :

ধর্ম, জাতি, শ্রেণী, জাতপাত, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি

প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনও নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও প্রতিষ্ঠানপন্থীরা সাধারণত ধরে নেন যে তাঁদের উল্লিখিত সমাজ হল উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক (বহুত্ববাদী)। তাঁরা ধরে নেন যে তাঁদের আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের নীচু থেকে গঠিত, উপর থেকে সেগুলিকে সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তাঁর ধরে নেন যে সামাজিক শক্তিগুলির স্বাধীন কাজকর্মের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠানগুলি আকৃতি পায়। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি আদৌ কোনও তত্ত্বের মধ্যে প্রোথিত হয়, তাহলে সেটি হল গণতান্ত্রিক তত্ত্ব। ডেভিড এপটার যেমন বলেন, "সুশৃঙ্খল স্বাধীনতা কীভাবে অর্জন করা যায়, সেটাই হল প্রতিষ্ঠানপন্থীদের প্রাথমিক সমস্যা।"

গণতন্ত্রের প্রশ্নটির সঙ্গে প্রতি ানগুলি কীভাবে জড়িত, এপটার সেই বিষয়টিকে আরও বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন : "গণতন্ত্রকে কার্যকর করে তোলার জন্য জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন। কিন্তু জনগণের সার্বভৌমত্বের জন্য শাসনাধীন মানুষদের সম্মতি প্রয়োজন। এবং ব্যক্তি জীবনের কিছু সংরক্ষিত ক্ষেত্র বাদ দিলে জনগণের সার্বভৌমত্ব সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারের জন্ম দেয়। কাজেই সরকার সীমিত হওয়া আবশ্যক—কতটা সীমিত তা সাংবিধানিক ব্যাপার। কিন্তু এ সত্ত্বেও কর্মদক্ষ হতে গেলে সীমিত সরকারকেও তার ক্ষেত্রটিতে কাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। অবশ্য দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা লাভ করার জন্যও আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাজেই আইনসভা ও জনগণ,

উভয়ের কাছেই অর্পণ করা হয়ে থাকে। জনগণের দায়িত্বকে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজন ভোটাধিকার, যা কার্যকর করতে পারে সেই নির্দিষ্ট নির্বাচনী ব্যবস্থা ছাড়া দলগুলির পক্ষে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় নামা সম্ভব নয়। নির্বাচনী ব্যবস্থা ধরে নেয় যে, জনগণ যে সব বিষয় সম্পর্কে অবহিত, সেগুলির বিষয়ে ভোট দেবার বোধশক্তি তাঁদের আছে। ওয়াকিবহাল জনগণের প্রয়োজন এক স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অঙ্গীকার ও একত্রিত হওয়ার অধিকার, যেগুলির সাহায্যে তাঁরা বিপরীত মতগুলি জানাতে পারেন। এই উপাদানগুলি ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ও তার ভারসাম্য বজায় রাখে।"

কাজেই গণতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নেয়, যথা শাসক ও সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে তাঁরা এমনভাবে মধ্যস্থতা করে যে ক্ষমতার সামনে সামাজিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং শাসকগোষ্ঠী সামাজিক শক্তিগুলির প্রতি সংবেদনশীল ও কৈফিয়তযোগ্য থাকে। তুলনামূলক রাজনীতির গবেষকরা কাজেই প্রতিষ্ঠানীকরণের মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে গণতা ি ক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন, ওই সব ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীবিভাজন করতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন সরকারি, প্রায়-সরকারি ও প্রায়-সামাজিক) আপেক্ষিক শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন অথবা যে কোনও একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান (দল ব্যবস্থা বা আইনসভা বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা ট্রেড ইউনিয়ন) সম্পর্কে গবেষণা করতে পারেন। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংবিধানগুলি যে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে, সেই সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এছাড়াও তুলনাবাদীরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং কিছু নির্দিষ্ট দেশে সেগুলির কারণ ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারেন।

কিন্তু তুলনামূলক রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির উচিত নয় নিজের অনুসন্ধানের বিষয়কে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখা। সত্যিই এমন কিছু দেশ আছে, যেগুলির বৈশিষ্ট্য হল 'ব্যক্তিগত শাসন', জুয়ান লিনজ-এর ভাষায় যেখানে "প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, রাজনীতিবিদেরা নিজেরাই ব্যবস্থার কাঠামো গঠন করেন।" কিন্তু এইসব দেশগুলি ছাড়াও, বহু অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে সামরিক শাসনও আছে) রয়েছে, যেগুলি সারণি ৩.৩-এ উল্লেখিত প্রায় সবকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে পালন করে ও টিকেয়ে রাখে। তবুও এই সব অ-গণতান্ত্রিক শা নের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা, কাজকর্ম এবং লক্ষ্য তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিরূপগুলি (counterpart) থেকে অনেক পৃথক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে 'প্রতিনিধিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে 'দ্বাররক্ষা' (gatekeeping)-এই দুটি কাজই করে থাকে, কিন্তু অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে তারা 'দ্বাররক্ষা-র কাজেই বেশি মনোনিবেশ করে।

কর্পোরেটবাদী বা নয়া-কর্পোরেটবাদী ব্যবস্থাগুলিতে আর এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দেখা মেলে। (কর্পোরেটবাদ বলতে বোঝায় সমাজকে এক সমিতিতে সংগঠিত করা, যা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের এক অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে এবং তার এক্তিয়ারে থাকা ব্যক্তি ও ক্রিয়াকলাপের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখবে) এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষত অ-সরকারি সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলি ভিন্ন কাঠামোর এবং বহুত্ববাদী ব্যবস্থার থেকে পৃথকভাবে কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। এই ধরনের কর্পোরেটবাদী বন্দোবস্তের ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত হল নাৎসি ও ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা। অবশ্য কর্পোরেটবাদী প্রাতিষ্ঠানিক রীতির

উপাদানগুলি (সামান্য বা যথেষ্ট মাত্রায়) বহু স্থিতিশীল পশ্চিমী গণতন্ত্রেও যেমন অস্ট্রিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলি, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও আরও অনেকগুলি দেশে লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের কর্পোরেটবাদী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক পরি াম, ফিলিপ স্মিটারের ভাষায় 'বিতর্কিত'। স্মিটার দেখিয়েছেন যে, অভিজ্ঞতা অনুসারে এই আপাত অগণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ধারাগুলি সম্ভবত "কৈফিয়তবদ্ধতা ও সবেদনশীলতা", দুটিকেই উন্নত করে। অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ও নির্দিষ্ট সমাজে কর্পোরেটবাদী প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হয়তো সামগ্রিক গণতন্ত্রকে উৎসাহ দেয়, তা যতই ব্যঙ্গাত্মক শোনাক না কেন।

এখানে উল্লেখ করার মত বিষয় এই যে, কাঠামোগত-ব্যবহারিকতা ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের থেকে পুরানো হলেও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বিভিন্ন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বর্ণনা ও অনুসন্ধান করার দিকেই শুধুমাত্র তুলনাবাদীদের পরিচালিত করে না, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তগুলির শ্রেণীবিভাজন ও তাদের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সম্পর্ক স্থাপন করার চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি করে। এইভাবে বিচার করলে তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির এক গতিশীল চরিত্র আছে, যা তাকে প্রাচীন ও জীর্ণ হতে দেয় না।

৩.৭ নয়া প্রতিষ্ঠানতন্ত্র

১৯৮০-এর দশকে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত হয়। 'নয়া প্রতিষ্ঠানতন্ত্র' নামে পরিচিত এই পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধুমাত্র মধ্যবর্তী সংগঠন ও কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, যেগুলি সামাজিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব করে ও তাদের নিয়ন্ত্রণও করে যাতে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর গঠন সম্ভবপর হয়ে ওঠে : এই নতুন পরিপ্রেক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব (actor) বা কর্মী হিসাবে দেখে, যারা নিজেরাই নিজেদের কৌশল ও কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে।

বড় মাপের তুলনামূলক ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানেও মার্কসবাদে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি এই মতকে আরও শক্তিশালী করেছে। সেগুলির মনোযোগের বিশেষ লক্ষ্য হল সেই সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি, যাকে রাষ্ট্র বলা হয়। থেডা স্কোপোল, পিটার ইভান্স, ডিয়েট্রিক রুশমেয়ার, জন স্টিফেনস ও তুলনামূলক ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র এক স্বাধীন গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে যার সম্পদের এক শক্তিশালী ভিত্তি ও স্বতন্ত্র স্বার্থ আছে। সম্পদের এই ভিত্তি ও স্বতন্ত্র স্বার্থ রাষ্ট্রকে সেই সব প্রথাগত কর্তৃত্বের অধিকারী গোষ্ঠীগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার কারণ ও সামর্থ্য যোগায়। যারা রাষ্ট্রকে তার লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তার কর্মসূচী রূপায়নের প্রয়াসে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সংস্থাগুলি থেকেও সাহায্য পায়।

একইভাবে শ্রেণী বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর ক্ষমতার সম্পদ (Power resoruces) থাকলেও বা তাদের এমন সামর্থ্য দিতে পারে না, যার সাহায্যে তারা এই সম্পদকে 'সংহত, শ্রেণী পরিচালিত' রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে পারবে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকরা, অর্থাৎ উচ্চ স্তরের রাজনীতিবিদ ও আবিষ্কারকরা তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট

পরিমাণ সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্যের সাথে পুঁজিবাদীদের লক্ষ্য এক হলেও, সব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। দুইয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে পুঁজিবাদীদেরই জয় হবে। এছাড়াও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও নিরবচ্ছিন্ন পারস্পরিক যোগাযোগের দরুণ স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাপকরা সর্বদাই এক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। এই সত্যটির স্বীকৃতি রাজনীতির শ্রেণি বিশ্লেষণকে 'ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক দিক গুলির সমস্যা'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত করে। রাষ্ট্রকে দেখা হয় "পুঁজিবাদী সমাজে নিছক এক রাষ্ট্র নয়, বরং এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে।"

প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেটবাদ বিষয়ে লেখকেরাও এই 'নয়া প্রতিষ্ঠানতন্ত্রকে' সমর্থন করেছেন, যেহেতু এরা রাষ্ট্রকে স্বনির্ভর ও কার্যকর, সমাজে শক্তিশালী গোষ্ঠী গঠনকারী (তাদের লক্ষ্যে পরিণত না হয়ে) বস্তু হিসাবে চিত্রিত করে। স্মিটারের মতে, কর্পোরেটবাদের অধীনে "ব্যক্তিদের সরিয়ে সংগঠনগুলিই প্রধান কুশীলব রূপে দেখা দেয়।"

প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের এই ধারণা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে জোয়েল মিডগাল লেখেন : "সমাজ কীভাবে টিকে থাকে ও পরিবর্তিত হয়, তার ধারণা শুরু হওয়া উচিত সংগঠনগুলি থেকে, যারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করে, ব্যক্তির ইচ্ছাকে সংগঠনের নির্দিষ্ট করে দেওয়া আচরণবিধির অধীন করে তোলে। পরিবার ও প্রতিবেশী গোষ্ঠী থেকে শুরু করে বিশাল বিদেশি সংস্থা, এইসব অনুপচারিক ও বিধিবদ্ধ সংগঠনগুলি বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা, পুরস্কার ও প্রতীক ব্যবহার করে মানুষকে খেলার নিয়ম মেনে আচরণ করতে প্ররোচিত করে। এগুলি হল রীতি ও আইন, যা গ্রহণযোগ্য আচরণের সীমা নির্দিষ্ট করে এবং সেগুলির মধ্যে থাকতে পারে কোন বয়সে বিবাহ করতে হবে, কোন ফসল ফলাতে হবে, কোন ভাষায় কথা বলতে হবে ও আরও অনেক কিছু।"

রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর এই মতকে (একটি নতুন মডেল) "নানা বস্তুর মিশেলের মধ্যে থাকা সংগঠন" ("Organizations in a melauge") আ ্যা দিয়ে মিডগাল বলেন : "এখানে উপস্থাপিত মডেলটি—নানা বস্তুর এক মিশেল, যেখানে বহু সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্র একটি—সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের উপর মনোনিবেশ করে। আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থাতে এই সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে রাষ্ট্র। তবুও, কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান আর বিজয় অবধারিতভাবে সমার্থক নয়।"

"নয়া প্রতিষ্ঠানতন্ত্র" পরিপ্রেক্ষিতের সৃষ্ট ধারণাগুলিকে আরও সংহত করা ও আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অবশ্য এটা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য আরও সক্রিয় কর্মক্ষেত্রের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে, "নানা বস্তু মিশেলের মধ্যে থাকা সংগঠনগুলির মধ্যে রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থতা ও স্বশাসনের উপর গুরুত্ব দিয়ে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করে এই ধারণাগুলি তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কয়েকটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৩.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১. Gabriel Almond and James Cloeman (eds.) The Politics of Developing Areas (Princeton, N. J. : Pricceton University Press. 1960)

২. DaviËd Easton. A Framework for Political Analysis (New Jersey : Prentice-Hall. 1965)

৩. Gabriel Almond and Bingham Powell. Comparative Politics : A Developmental Approach (Boston : Little Brown 1966)

৪. William Flanigan and Eduria Flogelman. "Functional Analysis" in James Charlesworhth (ed). Contemporary Political Analysis (New York : The Free Press. 1967)

৫. Sauuel P. Huntington. Political Order in Changing Soceities (New Haven : yale University Press. 1968)

৬. Robert T. Holt and John Richardson. "Competing Paradigms in Comparative politics" in Robert T. Holt and John E. Turner (eds.) The Methodology of Comparative Research (New York : The Free Press. 1970)

৭. David & Apter. Introduction to Political Analysis-Unit III (New Delhi : Prentice Hall of India. 1978)

৮. James A. Bill and Robert H. Hardgrave. Comparative Politics : The Quest for Theory (Washington D. C : The University Press of America. 1981)

৯. Roy C. Macridis and Bernard E. Brown (eds). Comparative Politics : Notes and Readings California : Brooks Cole Publishing. 1990)

১০. Joel S. Midgal. "A Model of State-Society Relations" in Howard J. wiarda (ed) New Direction in Comparative Politics (Boulder : Westview Press. 1991)

১১. Joel Krieger (ed). The Oxford Companion to Politics of the World (New york : OUP. 1993).

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

পর্যায় ঃ দ্বিতীয়

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ১ নির্ভরতা তত্ত্ব ঃ পরিচিতি

গঠন

১.১ পটভূমি

১.২ সংজ্ঞা

১.৩ কাঠামোগত চরিত্র

১.৪ মূল বক্তব্য

১.৫ তাৎপর্য

পটভূমি

নির্ভরতা তত্ত্বের জন্ম ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে, যখন ইউনাইটেড নেশনস ইকনমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকার পরিচালক রল্ প্রেবিশ্চ (Raul Prebisch) এবং তাঁর সহযোগীরা লক্ষ্য করেন যে, উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়নের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। এই পর্যবেক্ষণ তাদের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইঙ্গিত করে যে, ধনী দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। নব্যসনাতনী তত্ত্ব (neoclassical theory) এই ধরনের কোনও সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেয়নি—তা ধরে নিয়েছিল যে সর্বদা সমান পরিমাণে না হলেও, অর্থনৈতিক বিকাশের সুফল অল্পবিস্তর সকলেই ভোগ করতে সক্ষম হবে।

এই বিষয়ে প্রেবিশ্চের প্রাথমিক ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার। তাঁর মতে, দরিদ্র দেশগুলি প্রাথমিক পণ্যদ্রব্যগুলি ধনী দেশগুলিতে রপ্তানি করে। ধনী দেশগুলি সেগুলির সাহায্যেই পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং দরিদ্র দেশগুলিকেই সেই সব সামগ্রী আবার বিক্রী করে। কোনও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করার সময় যে মূল্য যুক্ত (value addedd) হয়, তা সেই পণ্যগুলির দামকে সর্বদাই তাদের প্রাথমিক উপাদানগুলির দামের থেকে বাড়িয়ে তোলে। কাজেই, রপ্তানি করে দরিদ্র দেশগুলি সেই পরিমাণ উপার্জন করতে পারে না, যার সাহায্যে তারা আমদানির খরচ মেটাতে পারে।

এই সমস্যার সমাধানে প্রেবিশ্চ যে উপায় বাতলেছেন, সেটিও একই রকমের স্পষ্ট। দরিদ্র দেশগুলির উচিত বিকল্প আমদানি কর্মসূচী গ্রহণ করা যাতে ধনী দেশগুলি থেকে ব্যবহারযোগ্য পণ্যসামগ্রী আমদানি করার কোনও প্রয়োজন তাদের না হয়। দরিদ্র দেশগুলি আর্ন্তজাতিক বাজারে তাদের প্রাথমিক উপাদানগুলি বশ্যই বিক্রী করবে, কিন্তু তাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার বিদেশ থেকে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী কেনার জন্য ব্যবহার করতে হবে না।

এই নীতি অনুসরণ করতে গেলে তিনটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত, যে অর্থনৈতিক মানদন্ড, অর্থাৎ বেশী পরিমাণ ক্রেতার ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ধনী দেশগুলি যেভাবে কম দামে পণ্য বিক্রী করতে পারে—দরিদ্র দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বাজার সেই পরিমাণ বড় নয়। দ্বিতীয় সমস্যার চরিত্রটি রাজনৈতিক—প্রাথমিক উপাদানগুলির উৎপাদক ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব অথবা কাম্য কীনা, সেই বিষয়ে দরিদ্র দেশগুলির দ্বিধা। তৃতীয় এবং শেষ সমস্যাটি হল প্রাথমিক উপাদানগুলির উপর দরিদ্র দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, বিশেষত বিদেশে সেগুলি বিক্রী করার ক্ষেত্রে। বিকল্প আমদানি নীতির পথে এই বাধাগুলিই কিছু মানুষকে ঋমী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে আরও সৃজনশীল ও ইতিহাসমুখী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দরিদ্র দেশগুলির একটানা দারিদ্রের এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসাবে অধীনতা তত্ত্ব এই সময়ে নিজেকে উপস্থাপিত করে। চিরাচরিত নব্য সনাতনী তত্ত্ব এই বিষয়ে প্রায় নীরবই বলা যেতে পারে। নব্য সনাতনী তত্ত্বের একমাত্র বক্তব্য ছিল এই যে, মজবুত অর্থনীতির চর্চায় দরিদ্র দেশগুলি বিলম্বে যোগ দিয়েছিল এবং যখনই তারা আধুনিক অ নীতির কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেলবে, তখন থেকেই তাদের দারিদ্র হ্রাস পেতে আরম্ভ করবে। মার্কসাবাদী তাত্ত্বিকেরা অবশ্য এই একটানা দারিদ্রের জন্য ধনতান্ত্রিক শোষণকে দায়ী করেন। বিশ্বব্যবস্থা দৃষ্টিভঙ্গি (world system approach) নামে পরিচিত এক নতুন চিন্তাধারা আবার দাবি করে যে দারিদ্র হল আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বিবর্তনের এক প্রত্যক্ষ পরিণাম, যা এক কঠোর ও অনমনীয় শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে ধনীদের উপকার ও দরিদ্রদের ক্ষতি করেছে।

১.২ সংজ্ঞা

উদারপন্থী সংস্কারক (প্রেবিশ্চ), মার্কসবাদী চিন্তক (আন্দ্রেগুন্ডার ফ্র্যাঙ্ক) এবং বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের (ওয়ালার স্টেইন) প্রবক্তাদের মধ্যে যে সব বিতর্কের উৎপত্তি হয়, সেগুলি ছিল যেমন সজীব তেমনই বুদ্ধিদীপ্ত। তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে এখনও মতভেদ রয়েছে, কাজেই তাকে একটিই সমন্বিত বা একীভূত (unified) তত্ত্ব হিসাবে ভাবা ভুল হবে। তবুও বেশিরভাগ তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণের মধ্যে কয়েকটি মূল বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর বিদেশি প্রভাবের (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক) মাপকাঠিতে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রগতির ব্যাখ্যাকে নির্ভরতা সংজ্ঞা হিসাবে ধরা যেতে পারে। (Osvaldo Sunkel, "National Development Policy and External Dependence in Latin America," The Journal of Development Studies, vol. 6. no. 1, October 1969, p. 23)। থিওটোনিও দস স্যান্টোস তাঁর সংজ্ঞায় সম্পর্কের ঐতিহাসিক দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঃ "নির্ভরতা হল একটি কয়েকটি দেশের ক্ষতিসাধন করে এবং অধীনস্থ অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনাকে এক সীমিত গন্ডির মধ্যে আটকে রাখে.....এটি এমন এক অবস্থা যেখানে নির্ভরশীল দেশগুলির অর্থনীতির চাবিকাঠি থাকে নিয়ন্ত্রক দেশগুলির অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসারের হাতে" (Theotonio Dos Santos, "The

Structure of Dependence," in K T Fann and Donald C Hodges, eds. Readings in US Imperialism. Boston : Porter Sargent, 1971, p. 226)

নির্ভরতা তত্ত্বের বেশিরভাগ প্রবক্তাই অবশ্য এই সব সংজ্ঞাগুলির তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করেন। প্রথমত, নির্ভরতা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে দুটি গোষ্ঠীতে বিভাজিত করে, যেগুলিকে কর্তৃত্বকারী/অধীনস্থ, কেন্দ্রীয়/প্রান্তিক অথবা মহানগরী/উপনগরী ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি সকেলেই উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ এবং Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)-র অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলি হল লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার সেই দেশগুলি যাদের মাথাপিছু জাতীর উৎপাদন কম এবং বিদেশী মুদ্রা উপার্দনের জন্য যারা শুধুমাত্র একটি কোন পণ্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়ত, দুটি সংজ্ঞাই ধরে নেয় যে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিদেশি শক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সব বহির্শক্তির মধ্যে আছে বহুজাতিক সংস্থা, আর্ন্তজাতিক পণ্যের বাজার, বিদেশী সহায়তা, যোগাযোগ এবং অন্য যে কোন পন্থা যার সাহায্যে উন্নত, শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি অন্যান্য দেশে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, নির্ভরতার সব কটি সংজ্ঞাই ইঙ্গিত করে যে কর্তৃত্বকারী ও নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক গতিশীল, কারণ এই দুই গোষ্ঠীর আন্তঃক্রিয়া (interaction) অসমতার চিত্রটিকে আরও পরিস্ফুট করে তোলে। এছাড়াও, নির্ভরতা এক গভীর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার শিকড় নিহিত রয়েছে ধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিকীকরণে। নির্ভরতা এক চলমান প্রক্রিয়া ঃ "ষোড়শ শতাব্দী থেকে এবং আজও লাতিন আমেরিকা অল্পোন্নতি অধুনা উন্নত দেশগুলির নিয়ন্ত্রিত এক আর্ন্তজাতিক ব্যবস্থরা সঙ্গে নির্দিষ্ট শ্রেণির কিছু সম্পর্কের পরিণাম (Susarre Bodenheimer, "Dependency and Imperialism : The Roots of Latin American Underdevelopment," in Fann and Hodges, Readings, op. cit. p. 157)

সংক্ষেপে প্রকাশ করলে, রাষ্ট্রগুলি মধ্যেকার আন্তঃক্রিয়ার নকশাটি পরীক্ষানিরীক্ষা করে এবং রাষ্ট্রগুলির অসমতাকে এই আন্তঃক্রিয়ার এক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাব দেখিয়ে নির্ভরতা তত্ত্ব আজকের বহু দেশের অল্পোন্নত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

১.৩ কাঠামোগত চরিত্র

নির্ভরতা তত্ত্বের বহু প্রবক্তা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রকেই নির্ভরতার সম্পর্কগুলির চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করেন। এই বিষয়ে প্রথম দিকের তাত্ত্বিক আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্কের মতামত বেশ পরিস্কার ঃ "ঐতিহাসিক গবেষণার পলে দেখা গেছে যে, সমকালীন অল্পোন্নতি অধুনা কর্তত্বকারী দেশগুলি এবং অল্পোন্নত নির্ভরশীল দেশগুলির মধ্যেকার অতীতের ও বর্তমানের চালু থাকা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কের ঐতিহাসিক পরিণাম। এছাড়াও, এই সম্পর্কগুলি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ধনতন্ত্রের সামগ্রিক রূপের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ" (Andre Gunder Frank, "The Development of Underdevelopment," in James D. Cockcroft, Andre Gunder Frank and Dale Johnson,

eds, Dependence and Underdevelopment. Garden City, New York : Anchor Books, 1972, p. 3)

এইমত অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে কঠোর আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের জন্ম হয়েছে, বিশ্বের বহু অঞ্চলে অল্পোন্নতির জন্য এই বিভাজনই দায়ী। অধীনস্থ বা নির্ভরশীল দেশগুলি সস্তা দরে খনিজ দ্রব্য, কৃষি পণ্য ও শ্রম সরবরাহ করে এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি, সেকেলে প্রযুক্তি ও উৎপাদিত সামগ্রীর এক ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। এর ফলে নির্ভরশীল দেশগুলির অর্থনীতি বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয় : এই সব দেশগুলিতে অর্থ, পণ্য, পরিষেবা পৌঁছয় ঠিকই, কিন্তু সেগুলির পরিমাণ নির্ধারণ করে তাদের নিজস্ব স্বার্থ নয়, কর্তৃত্বকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ। এই শ্রম বিভাজনই হল দারিদ্রের প্রধান কারণ ও এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না যে ধনতন্ত্র কার্যকর সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই শ্রম বিভাজনকে এক অনিবার্য শর্ত মনে করে। এর স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রকাশ মেলে তুলনামূলক সুযোগসুবিধার নীতি বা মতবাদে।

এছাড়াও নির্ভরতার মডেলগুলির অনেকটাই এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগই ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত থাকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির হাতে, যা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের ধারণার সঙ্গে একমত। যদি এই অনুমান সত্যি হয়, তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার যে কোন ধরনের প্রভেদই মিথ্যা হয়ে যায়। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে বহুজাতিক সংস্থার মতো বেসরকারি সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় যে কোন রকম ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা সকলেই মার্কসবাদী নন, আমাদের উচিত নির্ভরতা ও সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের মধ্যে এক স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানা। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রে বিস্তারকে ব্যবস্থা করে, যেখানে অধীনতা তত্ত্বের ব্যাখ্যার বিষয় হল অল্পোন্নতি। অন্যভাবে বলতে গেলে, মার্কসীয় তত্ত্বগুলি জানায় সাম্রাজ্যবাদ কেন ঘটে, যেখানে অধীনতা তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করে। এই দুইয়ের প্রভেদ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কসবাদীদের মতে সাম্রাজ্যবাদ অনেক দিক থেকেই এমন একটি প্রক্রিয়ার অঙ্গ, যা বিশ্বের রূপান্তর ঘটায় ও তার ফলে কমিউনিস্ট বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। ভারতে ব্রিটিশ উপনিববেশবাদকে অনুমোদনের সুরে মার্কস বলেছিলেন : "ভারতে ইংল্যান্ডকে দুটি লক্ষ্যপূরণ করতে হবে ঃ একটি ধ্বংসাত্মক অপরটি পুনরুজ্জবীনূলক। অর্থাৎ প্রাচীন এশীয় সমাজের বিনাশ করা এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা (Karl Marx, "The Future Results of the British Rule in India," New York Daily Tribune, No. 3840, August 8, 1853). । নির্ভরতা তত্ত্বের মতে অল্পোন্নতি এক সম্পূর্ণ নেতিবাচক অবস্থা, যা নির্ভরশীল রাষ্ট্রকে কোনও রকম স্থায়ী ও স্বশাসিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দেয় না।

এছাড়াও মার্কসদের মতে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকেই নিজে বিনাশ করে, যেখানে অধীনতা বা নির্ভরশীলতার সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে থাকে। লেনিনবাদ অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদ তখনই ধ্বংস হয় যখন ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকা শোষণের সুযোগগুলি কব্জা করতে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত

হয়। লেনিনের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই বক্তব্যের এক বড় প্রমাণ। যুদ্ধ শেষ হবার পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির আগেকার উপনিবেশগুলি দখল করে। নির্ভরতা তত্ত্বের একজন প্রবক্তা এই বক্তব্য মানতে রাজি নন। কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট পরিচয় যাই হোক না কেন, নির্ভরতা সম্পর্ক থাকতেই পারে। অধীনস্থ বা নির্ভরশীল এলাকা ভাগাভাগি নিয়ে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির লড়াই কোনওভাবেই তেমন প্রাসঙ্গিক তথ্য নয় (এই সম্ভাবনাটি বাদ দিয়ে যে কর্তৃত্বকারী দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে নির্ভরতার সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে সমগ্র আধুনিক যুগ ধরে পৃথিবীর প্রায় একই অঞ্চলগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্রের ঘটনা ঘটে চলেছে তা সেই অ লের কর্তৃত্ব যে রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক না কেন।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, কোনো কোনো তাত্ত্বিক নির্ভরতার সম্পর্কের চালিকাশক্তি হিসাবে ধনতন্ত্রকে চিহ্নিত করতে রাজী নন। এই সম্পর্ককে প্রথমেই বজায় রাখে এক ক্ষমতাব্যবস্থা, এবং এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে শুধুমাত্র ধনতন্ত্রই এই ক্ষমতার পিছনে সমর্থন আগায়। যেমন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নির্ভরশীল দেশগুলির (পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ও কিউবা) মধ্যেকার সম্পর্ক এবং দরিদ্র ও উন্নতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অনেকটা একই রকম। কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির থেকে ক্ষমতার অসাম্যই নির্ভরতার জন্য বেশি দায়ী হবার সম্ভাবনাটি বেস কৌতূহল জনক এবং সেটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চিরাচরিত বিশ্লেষণ, যেমন বাস্তববাদের (realism) সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ।

১.৪ মূল বক্তব্য

নির্ভরতা তত্ত্বের মূলে আছে বেশ কয়েকটি বক্তব্য, যাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই বিতর্কের অবকাশ আছে। বক্তব্যগুলির মধ্যে আছে :

১. অল্পোন্নত (underdeveloped) অবস্থার সঙ্গে অনুন্নত (underdevelped) অবস্থার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনুন্নত বলতে এমন এক অবস্থা বোঝানো হয় যেখানে সম্পদকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যেমন, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে এক অনুন্নত অঞ্চল হিসাবে দেখতেন। কারণ, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার জমিতে সঠিকভাবে চাষ করা হত না। অল্পোন্নত হল এমন এক অবস্থা, যেখানে সম্পদকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তা এমনভাবে করা হচ্ছে যে এর সুফল ভোগ করছে শুধু কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি, সম্পদের মালিক দরিদ্র দেশগুলি নয়।

২. অল্পোন্নত ও অনুন্নত অবস্থার প্রভেদ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিকে এক সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে। এই দেশগুলি পিছিয়ে পড়া নয় বা ধনী দেশগুলিকে 'ধরে ফেলার' কোন প্রচেষ্টাতেও রত নয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) মূল্যবোধের বিচারে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির থেকে পিছিয়ে পড়াও এদের দারিদ্রের কারণ নয়। তারা দরিদ্র কারণ শুধুমাত্র কাঁচা মালের উৎপাদক বা সস্তা শ্রমের ভান্ডার হিসাবে তাদের জোর করে ইউরোপীয় অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে, তেমনভাবে তাদের সম্পদ বিপণনের সুযোগ থেকে রক্ষিত করা হয়েছে।

৩. নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে, কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির চাপিয়ে দেওয়া সম্পদ ব্যবহারের প্রণালী থেকে সরে গিয়ে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ অনেক বেশী কাম্য। এই কাম্য প্রণালীগুলির কোনা স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও কিছু কিছু শর্তের বা নীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, রপ্তানি কৃষির (export agriculture) যে নীতি কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি অনুসরণ করে, নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা তার বিরোধী। কারণ, রপ্তানির জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেও বহু দরিদ্র দেশে অপুষ্টির হার মারাত্মকভাবে বেশী। বহু তাত্ত্বিকই মনে করেন যে অপুষ্টিক হার কমাতে কৃষিজমি ব্যবহার করা উচিত দেশের নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করার জন্য।

৪. আগের বক্তব্যটিকে আরও প্রসারিত কার যেতে পারে : নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তরা বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব এক স্পষ্ট "জাতীয়" অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে, যা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় এবং ব্যক্ত করা উচিত। এই বিষয়ে নির্ভরতা তত্ত্ব ও বাস্তববাদের অবস্থান প্রকৃতপক্ষে একইরকম। নির্ভরতা তত্ত্বের স্বাত এইখানে যে এর প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন যে এই জাতীয় স্বার্থ শুধুমাত্র সমাজের দরিদ্র শ্রেণির প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব, ব্যবসায়ী শ্রেণি বা সরকারের তৃপ্তি সাধন করে না। দীর্ঘ মেয়াদী বিচারে দরিদ্রের জন্য পন্থা কী, তা নির্ণয় করা এক দুরূহ বিশ্লেষণমূলক সমস্যা। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের কোন প্রয়োগগত (operational) সংজ্ঞা নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা এখনও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি।

৫. দীর্ঘ সময় জুড়ে সম্পদ অপসারণের (একথা মনে রাখা উচিত যে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবিস্তারের সময় থেকে অধীনতার সম্পর্ক চলে আসছে) এই প্রক্রিয়াটি শুধু কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলিই বজায় রাখেনা, তাদের সাহায্য করে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল দেশগুলির উচ্চশ্রেণির বা 'এলিট' (elite) সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাও। নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, এই 'এলিট' সম্প্রদায় নির্ভরতার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চান, তারণ তাদের নিজস্ব স্বার্থের সঙ্গে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ মিলে যায়। এরা প্রশিক্ষণ লাভ করেন কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলিতে এবপং তাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ভাগীদার হয়ে ওঠেন। কাজেই, নির্ভরতার সম্পর্ক বাস্তবে এক "স্বেচ্ছামূলক" সম্পর্ক। এ বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই যে, অধীনস্থ রাষ্ট্রের 'এলিট' সম্প্রদায় সচেতনভাবে নিজেদের দেশের দরিদ্র শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন ; তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে অর্থনৈতিক বিকাশের চাবিকাঠি আছে উদারপন্থী অর্থনৈতিক মতাদর্শের হাতে।

১.৫ তাৎপর্য

নির্ভরতা তত্ত্বের বিশ্লেষণটি যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে দরিদ্র অর্থনীতিগুলির বিকাশের প্রশ্নটি তুলনামূলক সুযোগসলুবিধা পুঁজি সঞ্চয় এবং আমদানি/রপ্তানি সংক্রান্ত চিরাচরিত প্রশ্নগুলির থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নতুন বিষয় হল ঃ

১. উন্নত, শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির সাফল্যকে এখনকার উন্নতিশীল অর্থনীতিগুলির আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হয় না। যখন অর্থনৈতিক বিকাশ ছিল অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু, তখন বিশ্লেষণী কৌশল (এবং মতাদশ৪গত ঝোঁক) ছিল যথেষ্ট স্পষ্ট : প্রত্যেকটি দেশেরই প্রয়োজন ছিল ঋণী দেশগুলির নকশা অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ ও ১৯৬০-র দশকে এক ঐকমত্য দেখা দিয়েছিল যে বিকাশের

কৌশল (growth strategy) বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, যে ঐক্যমতের সব থেকে স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে ওয়াল্ট রসেটোডের 'দি স্টেজস অফ ইকনমিক গ্রোথ' গ্রন্থে। নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে, ধনী দেশগুলির সাফল্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক অত্যন্ত অনিশ্চিত ও নির্দিষ্ট পর্যায়, যার নিয়ন্ত্রমের ক্ষমতা ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির অত্যন্ত শোষণমূলক উপনিবেশীয় সম্পর্কগুলির হাতে। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি সম্ভাবনা এখন খুবই কম।

২. নির্ভরতা তত্ত্ব কেন্দ্রীয় বন্টন পদ্ধতির নব্য সনাতনী চুঁইয়ে পড়া মডেলটিকে অস্বীকার করে, যাকে সাধারণত (trickle-down) অর্থনীতি আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক বিকাশের নব্য সনাতনী মডেলটি সম্পদ বন্টনের বিষয়টিকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর প্রাথমিক সম্পর্ক হল কার্যকর উৎপাদনের সঙ্গে এবং এ ধরে নেয় যে, বাজার যুক্তিসঙ্গত ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় এই কার্যকর উৎপাদনের পুরস্কার দেবে। কোনও সুসংহত, প্রবহমান অর্থনীতির ভিতরে—যেখানে মানুষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং যেখানে ব্যবহার বা ক্রয়ের ধরনগুলি জাতি, বণ, লি ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক (non-economic) পক্ষপাতের হাতে বিকৃত হয়ে ওঠে না—অবশ্য এই অনুমান প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। উন্নতিশীল অর্থনীতিগুলিতে এই প তিগুলি পরিব্যাপ্ত নয় এবং নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তরা মনে করেন যে দরিদ্র অর্থনীতিগুলিতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সহজে ছড়িয়ে পড়ে না। এই সব কাঠামোগত কারণে এই তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, বন্টনব্যবস্থার জন্য শুধুমাত্র বাজার যথেষ্ট নয়।

৩. বাজার যেহেতু ধু উৎপাদনশীলতার মুল্য দেয়, তাই নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা জিডিপি (GDP) অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদন বা বাণিজ্য সূচকের (tradeindice) মত সমষ্টিগত পরিমাপকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল রাষ্ট্রের মধ্যেও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চলে। কিন্তু তাঁরা অর্থনৈতিক বিকাশ (economic growth) ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের (economic development) মধ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেন। যেমন, অধীনতার কাঠামোর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সামগ্রিকভাবে দেশের উপকার করছে কী না। সেই কারণে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল (Life expectancy), সাক্ষরতা, শিশু মৃত্যুর হার, শিক্ষার মত সূচকগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্ভরতা তত্ত্ব স্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক সূচকগুলির থেকে সামাজিক সূচকগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেয়.

৪. কাজেই নির্ভরশীল বা অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির উচিত স্বনির্ভরতার নীতি অনুসরণ করা। আর্ন্তজাতিক অর্থ ভান্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনুমোদিত নব্য সনাতনী মডেল যাই বলুক না কেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশী করে জড়িয়ে পড়া দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে অবধারিতভাবে মঙ্গালজনক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রায়শই অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতির সমার্থক বলে মনে করা হয় এবং এই নীতি নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়েছে, যেমন চীনে 'গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড' (great Leap Forward) বা উনি তান জানিয়াতে 'উজামা' (Ujamaa)। এই নীতিগুলির ব্যর্থতা এখন পরিষ্কার এবং এই ব্যর্থতাই ইঙ্গিত করে যে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এক সঠিক নির্বাচন নয়। বরং স্বনির্ভরতার নীতিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে এক নিয়ন্ত্রিত আন্তঃক্রিয়াকে অনুমোদন করে। বেশীর ভাগ নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করবে শুধুমাত্র এই শর্তেই দরিদ্র দেশগুলির বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে আদানপ্রদানে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

একক ২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

২.৩ কিউবার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান

২.৪ উপসংহার

ভূমিকা

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বহু সংখ্যক দেশের অল্পোন্নতি ও অতি ক্ষুদ্র এক অংশ, যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলির সমৃদ্ধির অনেক কারণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে আমরা এই বৈষম্যের উৎস, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলির উপর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নির্ভরশীলতা প্রসঙ্গ এই বিষয়ে নব্য মার্কসাবদী তাত্ত্বিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কিউবা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখব একটি দেশ কীভাবে তার নির্ভরশীলতার অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে ও কেন এই দৃষ্টান্তটি অন্যান্য অল্পোন্নত দেশগুলিতে আশার সঞ্চার করতে পারে অথবা পারে না।

২.২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীতে এক অর্থনৈতিক বিস্তার ও মেরুভবনের (ঠান্ডা যুদ্ধের শুরু) যুগ দেখা দেয়, যার আলোকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা তৃতীয় বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহ বোধ করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং রাজনৈতিক সুস্থিরতা প্রতিষ্ঠা করা (সো: ১৯৯০)। কিন্তু উন্নয়নের আধুনিকীকরণের ধারার এই সমাজবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য যে দেশগুলি, সেখানকার স্থানীয় বিদ্বজনেরা নিজেরাই তাদের নিজস্ব তত্ত্ব গঠন করতে শুরু করেন। এর কারণ অংশত হল আধুনিকীকরণ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নীতিগুলির সন্তোষজনক ফল দিতে ব্যর্থতা এবং তার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে সাম্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে "সক্রিয় উপায়ে যেখানে তাঁরা করছেন, সেই প্রান্তিক সমাজগুলিকে অল্পোন্নত করে রেখেছে" (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইকনমিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকা (ইসিএলএ-ECLA) কর্মসূচীর চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে লাতিন আমেরিকাতেই প্রথম আধুনিকীকরণের ধারার (Modernization school) পর্যালোচনা শুরু হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কর্মসূচী (ECLA) সংরক্ষণনীতি (Protectionist policy) ও তার সঙ্গে বিকল্প আমদানির মাধ্যমে শিল্পায়নকে উৎসাহ যোগায়, যার ফলে ১৯৫০-র দশকে এক স্বল্পস্থায়ী অর্থনৈতিক

প্রসারের পরেই দেখা দেয় অর্থনৈতিক নিশ্চলতা (কর্মহীনতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি)। সামগ্রিকভাবে, ECLA-র ব্যর্থতা ও তার পরিণতি হিসাবে আধুনিকীকরণের ধারার ক্রমশ লুপ্তি এবং এর সঙ্গে সনাতন মার্কসবাদের সঙ্কটের ফলেই জন্ম নেয় আজকের নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বগুলি।

সনাতনী নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব : তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে অল্পোন্নতি ও নির্ভরতা তত্ত্বের নতুন সংজ্ঞা নিরুপণের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস করেন পল বারান ও আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্ক।

বারানের মতে 'পিছিয়ে পড়া' বা 'অনগ্রসর' দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল তাদের দ্বৈত অর্থনীতি : এক বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও এক ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্র (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। কৃষিজাত পণ্য থেকে অতিরিক্ত মুনাফা ও উদ্বৃত্ত অর্থনীতির সৃষ্টির সম্ভাবনা এখনও অতি সামান্য। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের একশো চল্লিশ কোটি কৃষিজীবীর বিশ্ব বাণিজ্যে অবদান মাত্র তেরো শতাংশ (কিট : ২০০২)। বারানের মতে, উন্নয়নের পথে প্রাথমিক বাধাগুলি হল শ্রেণী সম্পর্ক ও উদ্বৃত্ত অর্থনীতি ব্যবহারের উপর তার পর্‌ভাব এবং ক্ষমতার বন্টন। অর্থাৎ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সমাধান (নির্ভরতা থেকে মুক্তি) হল এইরকম : অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রগুলির বিকাশের পূর্বশর্ত হিসাবে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পায়নকে উৎসাহ দেওয়া (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। এই বিষয়ে ফ্র্যাঙ্কের বক্তব্য বারানের বিপরীত।

ফ্রাঙ্কের মতে, অল্পোন্নতি বা 'অল্পোন্নতির অগ্রগতি-'র (development of underdevelopment) মূল কারণ হল 'মহানগরী' (metropole) ও 'উপনগরী'-র (satellite) ধারণা, যেখানে বাণিজ্যিক পুঁজির লক্ষ্যস্থল হল 'মহানগরী' এবং উপনগরী'-র অস্তিত্ব স্রেফ 'মহানগরী'-র প্রয়োজন মেটানোর জন্য। উদ্ধৃত অর্থনীতি সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল বাণিজ্য ও অন্যান্য ধরনের পণ্য ও পরিষেবা বিনিময়, যার মধ্যে রয়েছে আর্ন্তজাতিক এবং প্রান্তিক সমাজগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিনিময়ও। নির্ভরতার সমস্যার সমাধান হিসাবে ফ্র্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উচিত কার্যকরভাবে বিশ্ব বাজার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া, যাতে একটি দেশ বিকাশের সুযোগ পায় (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। আধুনিকীকরণের দ্বার যেখানে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে সেখানকার সংস্কৃতি, সঠিক জনসংখ্যা, বিনিয়োগের অভাব এবং এমনকী 'প্রকৃত সৃজনশীল' কিছু করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অনীহা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছে, ফ্র্যাঙ্ক যেখানে সোজাসুজি দায়ী করেছেন বাইরের কারণগুলিকে (যেমন তাদের উপনিবেশবাদের ইতিহাস)। এছাড়াও, ফ্র্যাঙ্ক দাবি করেন যে পাশ্চাত্য 'মহানগরী'-গুলিতে এই একই উন্নয়নের প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের 'উপনগরী'-গুলিতে একই সময়ে অল্পোন্নতিকে জিইয়ে রাখে (সো : ১৯৯০)।

শেষে সামির আমিন ও আরঘিরি এমানুয়েলের বক্তব্যের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কৃষি-শিল্প বা মহানগরী-উপনগরী থেকে আমিন কেন্দ্র (centre) ও প্রান্তে-র (periphery) ধারণায় সরে এসেছিলেন, যেখানে রয়েছে এক কেন্দ্র, যার আছে সাধারণত এক স্বনির্ভর, স্বকেন্দ্রিক (autocentric) পুনরুৎপাদনের কাঠামো এবং রয়েছে এক প্রান্তিক অর্থনীতি, যার বৈশিষ্ট্য হল এক 'অত্যুন্নত' (overdeveloped) রপ্তানি ক্ষেত্র (প্রকৃত অর্থে শোষিত) এবং যেখানে কৃষকেরা নিজেদের জন্য উৎপাদন করে আঞ্চলিক উন্নয়নকে

উদ্দাপিত করার বদলে বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত ও বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসে। একটা সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক। ধরা যাক আয়ারল্যান্ডের একটি সুপারমার্কেটে মোজাম্বিক বা কেনিয়ার উৎপাদিত শাকসব্জি সুন্দর মোড়কে শোভিত হয়ে বিক্রি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আয়ারল্যান্ডের মানুষদের কাছে ওই শাকসব্জি তেমন কোন প্রয়োজন নেই, বরং মোজাম্বিক বা কেনিয়ার কৃষকেরা তাদের উর্বর জমিতে ওর চআষ করে নিজেদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করলে উপকৃত হত। এই 'অত্যুন্নত' রপ্তানি ক্ষেত্র ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রান্তিক অর্থনীতির অধীনতার সঙ্গে আছে কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক অর্থনীতিগুলির মধ্যে পণ্যের অসম বিনিময়ের সমস্যা, যাকে এমানুয়েল (১৯৭২) এক তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন। কেন্দ্র বা প্রান্ত, কোথায় তারা কাজ করছে তার উপর ভিত্তি করে এখনও তাদের মজুরি নির্ণয় করা এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনে (রপ্তানি) ব্যবহৃত শ্রম ও প্রান্তিক দেশগুলিতে আমদানি করা পণ্যের (প্রযুক্তি, যন্ত্র) অসম বিনিময়কে এমানুয়েল সমস্যা হিসাবে দেখেছিলেন। সেনব্যাস (২০০১) আমিনকেই এই অসম বিনিময়ের ধারণার জন্য কৃতিত্ব আরোপ করেন। আমিন তাঁর পরের রচনা গুলিতে এমানুয়েলের ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেখানে তিনি অসম বিনিময়কে কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে এক সুপরিকল্পিত, 'বিশৃঙ্খল' (disturbed) ধনসঞ্চয়ের সক্রিয় শক্তি হিসাবে অভিহিত করেছেন, যা জন্ম দেয় এক অসমান আন্তঃনির্ভরতার। তাঁর মতে, এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন সংযুক্তি ও বিযুক্তির এক মিশ্র কৌশলের মাধ্যমে সক্রিয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের, যা বিশ্ব ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশীয় উন্নয়নকে উদ্দীপিত করবে।

সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বগুলির প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই তত্ত্বগুলি অল্পোন্নতি ও নির্ভরতাকে তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। বেশীরভাগ প্রবক্তাই পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির পিছনে বাইরের কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, অসম বিনিময়কে 'অন্য' দেশের চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে করেছেন এবং তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামো হল কেন্দ্র বনাম প্রান্ত। তাঁদের প্রস্তাবিত সমাধানের মধ্যে আছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আর্ন্তজাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ককে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ছেদ করা।

তত্ত্বগুলির প্রসারণ : এই 'সনাতনী' নির্ভরতা তত্ত্বগুলির উপরে ভিত্তি করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আরও পরীক্ষালব্ধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তা থেকে মনে হয় যে প্রচলিত তত্ত্বের সাহায্যে সমস্ত তথ্য বা পর্যবেক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় অল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রকৃত পরিবর্তন মানে সেই দেশগুলির মধ্যেই আবার বর্ধিত পৃথকীকরণ (মার্টির্চনুসেন : ১৯৯৭)। অন্য ভাবে বললে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একটি সমজাতীয় (homogeneous) গোষ্ঠী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বরং তাদের নিডস্ব (উপনিবেশবাদী) ঐতিহ্য এবং সামাজিক কাঠামোগুলি অন্তত বিবেচনা করা প্রয়োজন। এর জন্য আবার প্রয়োজন সনাতনী নব্য মার্কসবাদের অপেক্ষাকৃত আবদ্ধ ধারণাগুলিকে প্রসারিত করা এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। 'নতুন নির্ভরতা' ('new dependency') বিতর্কে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এফ এইচ কার্ডোসো এবং তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলির জন্য ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন-এর (ওয়ালারস্টেইন-এর পরবর্তী রচনাগুলিকে যদিও 'বিশ্ব ব্যবস্থা ধারা'-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)। এই নতুন ধারণাগুলির সঙ্গে সনাতনী নির্ভরতার ধারার সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে এক নম্বর সারণিতে দেখানো হয়েছে। (সারণি নং ১ দ্রষ্টব্য)

কার্ডোসোর দাবি, বিভিন্ন রকমের অভ্যন্তরীণ অবস্থার (ইতিহাস, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি) উপর নির্ভর করে বাইরের কারণগুলির প্রভাবও বিভিন্ন রকমের হবে। ফ্র্যাঙ্কের বিপরীত অবস্থান থেকে তিনি অধীনস্থ সমাজগুলির জাতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন এবং উন্নয়নকে রূপ দিতে তারা সক্ষম বলে মনে করেছিলেন। আমিনের স্বকেন্দ্রিক পুনরুৎপাদন নয়, এর ফলে দেখা দেয় বর্ধনশীল নির্ভরতা (development in dependency), যাকে নির্ভরশীল বা অধীন উন্নয়ন নামেও অভিহিত করা হয় (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭)। নির্ভরশীল উন্নয়নের এক লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল লোম কনভেনশনের (Lome convention) স্থাপন ও তার 'স্থায়ী' চরিত্র। ওয়ালারস্টেইনের পরবর্তী রচনাগুলিকে বিশ্ব ব্যবস্থা-ধর্মী বলে গণ্য করা হলেও তাঁর ভাবনায় বহু নির্ভরতার ধারার (Dependency school) ধারণার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, যেমন অসম বিনিময় ও কেন্দ্র-প্রান্ত শোষণ (সো : ১৯৯০)। কিন্তু নির্ভরতা ও অল্পোন্নতির বিষয়গুলিকে তিনি প্রত্যেকটি পৃথক রাষ্ট্র এবং বিশ্ব ব্যবস্থার ভিতরে তার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন (মার্টিনুসেন : ১৯৯৭) যেখানে নির্ভরতা তত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তারা জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নত করে চোখে পড়া সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

নির্ভরতা তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা কীরকম? ১৯৬০-র দশক থেকে বিশ্ব জুড়ে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে—রাজনৈতিক কাঠামোগুলির আর্ন্তজাতিককীকরণ হয়েছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি উপস্থিতি ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ও নব্য উদারতন্ত্র (neo-liberalism) এই সময়ের সম্ভবত সবথেকে বেশি নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমিন (২০০১), ফারাগ (২০০২) ও সুরিন (১৯৯৮)-এর সাম্প্রতিক রচনাগুলিতে নির্ভরতার ধারা এবং বিশ্ব ব্যবস্থার ভাবনার কিছু মিশ্রণ লক্ষ্য করা গেছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর লগ্নির বাজারের (financial market) ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রভাবের গুরুত্ব স্বীকার করা (অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজির মাধ্যমে নয়, স্রেফ টাকা খাটিয়ে 'উদ্বৃত্ত' অর্থের সৃষ্টি করা, যার কোন স্থিতিশীলতা নেই। তাত্ত্বিক কাঠামোটি অবশ্য এখনও দ্বিমাত্রিক (কেন্দ্র-প্রান্ত) ও নিয়ন্ত্রণবাদী (deterministic) উন্নয়ন ভিত্তিক, যদিও আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত আরও পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে অর্থাৎ গত কুড়ি কি ত্রিশ বছরে যে দেশগুলি তুলনামূলক বিচারে আরও বেশী বঞ্চিত হয়েছে (ফারাগ ২০০২ ; সুরিন ১৯৯৮), তাদের আমিন 'চতুর্থ বিশ্ব' নামে অভিহিত করেছেন। এই বিচারে তৃতীয় বিশ্বকে 'আধা-প্রান্তিক' (Semiperiphery) ও চতুর্থ বিশ্বকে 'প্রান্তিক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যদিও আমিন এই শ্রেণী বিভাজনের কথা উল্লেখ করেননি। অন্য দিকে, ওয়ালারস্টেইন বিশ্ব ব্যবস্থার তত্ত্বগুলিকে পুরোপুরি অনুসরণ করলেও সাম্প্রতিক এক রচনায় (২০০২) জাতীয় স্তরে শ্রেণী কাঠামো ও সমাজের বিষয়গুলির উপর নজর দিয়েছেন।

২.৩ কিউবার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান

এ কথা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে গত দশ বছর ধরে উন্নয়নও নির্ভরতা সংক্রান্ত বেশিরভাগ প্রথাগত ধারণাই কিউবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। প্রথমে আমরা ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ অবধি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব, পরে কৃষিক্ষেত্র ও বিশেষ করে কিউবার সমাজে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার দিকে নজর দেব এবং

শেষে নির্ভরতার জালে এখনও আটকে থাকা অন্যান্য দেশগুলির কাছে কিউবা কীভাবে এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করব।

বিকল্প মডেল : নির্ভরতা তত্ত্বের সনাতনী ধারা যাকে নির্ভরতার অবসানের পূর্বশর্ত মনে করে, কিউবায় সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটলেও, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি প্রত্যাশামতো বদলায়নি। এখন চল্লিশ বছর দীর্ঘ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার দরুন কিউবা সোভিয়েত জোটের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়ে COMECON-এর (Council for Mutual Economci Assistance) গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠে। এর ফলে ক্রমাগত আখ রপ্তানি করা হতে থাকে এবং শিল্পে ব্যবহার করার যন্ত্রপাতি, পেট্রল, কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য (agro-chemicals) ও প্রধান খাদ্যসামগ্রীগুলি বেশি করে আমদানি করা হতে থাকে (রসেট ও বেঞ্জামিন : ১৯১৪ ও এনরিকুয়েজ : ২০০০), যা আধুনিকীকরণের ধারার বক্তব্য অনুসরণ করে কৃষির সনাতনী মডেল মেনে চলারই সমান (ওয়ালারস্টেইন : ২০০২ ও এনরিকুয়েজ : ২০০০)। এছাড়াও কিউবার আখের জন্য সোভিয়েতরা আন্তর্জাতিক বাজারের দামের থেকে ৫.৪ গুণ বেশি দিত, যা কিউবার বিদেশী মুদ্রার ভান্ডারের আশি শতাংশ যোগান দিতে এবং যার ফলে কিউবার সামাজিক উন্নয়ন অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। এর কিছু অভ্যন্তরীণ সুফল হয়েছিল, যেমন এক চমৎকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও তুলনামূলক বিচারে এক প্রশংসনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এগুলির জন্য একে আধা-প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত করাই যথার্থ মনে করা হচ্ছি, কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান সোভিয়েত জোটের সঙ্গে কিউবার নির্ভরতার সম্পর্কটিরও আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটায় "হঠাৎই কিউবার বাণিজ্য বছরে আট বিলিয়ন ডলার হ্রাস পায়, আমদানি পঁচাত্তর শতাংশ হ্রাস পায় যার মধ্যে আছে খাদ্যসাগ্রী, যন্ত্রাংশ, কৃষি-রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহারের যন্ত্রপাতি" (ডঃ ফিউনেসকে উদ্ধৃত করে পার্কার : ২০০২)। অন্যান্য সূত্রের মতে, কীটনাশক আমদানি হ্রাস পায় বিরাশি শতাংশ (রসেট : ২০০২) ও কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার নব্বই শতাংশের বেশী কমে যায় (রসেট ও বেঞ্জামিন : ১৯৯৪)। আরও উদ্বেগজনক ব্যাপার হল এই যে, "আমদানি-কৃত সামগ্রী থেকে নাগরিকদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ সাতান্ন থেকে চুয়াল্লিশ শতাংশে নেমে যায়" (এনরিকুয়েজ : ২০০০), যা সেখানে এক সম্ভাব্য খাদ্য সঙ্কটের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং তখনও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকায় ও রাতারাতি তার বাণিজ্যসঙ্গীকে হারানোর ফলে কিউবাকে বিকল্প পথের অনুসন্ধান করতে হয়, যারা সাহয্যে নাগরিকদের এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। ঠিক এইখানেই কিউবার নিজস্ব ও অনন্য সাধারণ সামাজিক কাঠামো পরিত্রাতা হিসাবে দেখা দেয় : রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পকিল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেখানকার উচ্চশিক্ষিত নাগরিকেরা এক চমকপ্রদ 'সবুজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' ('greening of the socialist revolution) ঘটিয়ে ফেলেন, যা এখন বিকল্প মডেল নামে পরিচিত। কৃষিব্যবস্থায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, সেগুলি হল :

জৈব কৃষির বিকাশ, যার অন্তর্ভুক্ত হল জৈব-সার ও জৈব-কীটনাশকের গবেষণাসিদ্ধ প্রয়োগ ও পর্যায়ক্রমে শস্যের চাষ (Crop rotation)।

রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বড় বড় খামারের জায়গায় ছোট ছোট কর্মসংস্থান গঠন করা ও পরিচালক মন্ডলীর আয়তন কমিয়েও দেশ জুড়ে এক সুসমন্বিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বজায় রাখা যার মধ্যে আছে উৎপাদনের অনুপাতে মজুর দেওয়া ও জমির মালিকানার অধিকার দেওয়ার নতুন নিয়মগুলি।

নগরভিত্তিক কৃষির (Urban agriculture) প্রচলন করা (যাকে 'agroponicos' বা 'organoponicos বলা হয়ে থাকে), যাতে এক লক্ষ লতের হাজার কর্মী নিযুক্ত থাকে এবং গ্রামে উৎপাদিত শাকসব্জীর থেকে কম দামে সমগ্র কিউবার প্রয়োজনের অর্ধেকই যে ব্যবস্থায় উৎপাদন করা হয় থাকে (কোভালেস্কি : ১৯৯৯)।

কিউবার নাগরিকেরা এখনও খাদ্য সঙ্কট থেকে মুক্তি না পেলেও এবং ১৯৯১-৯৫ সময়কালে খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ কমপক্ষে ষাট শতাংশে এসে দাঁড়ালেও (কোভালেস্কি : ১৯৯৯), কিউবায় কৃষি উৎপাদন বেশীরভাগ অঞ্চলেই ১৯৮০-র (পার্কার : ২০০২) স্তরে উঠেছে এসেছে এবং জৈব-কৃষির ক্ষেত্রে কিউবা এখন বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশে পরিণত হয়েছে (রসেট ঃ ২০০২)।

নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচার উপায় ? : "আমাদের বলা হয় যে ছোট দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না এবং দেশজ কৃষির অভাব পূরণ করার জন্য আমদানি করতে বাধ্য হয়। আমরা এটাও শুনে থাকি যে কৃত্রিম কৃষি-রাসায়নিক প্রয়োগ ছাড়া কোন দেশ তার নিজের জন্য যথেষ্ট খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিউবা কিন্তু কার্যত এই সবকটি ধারণাকেই ভুল প্রমাণ করে চলেছে। আমাদের বলা হয়, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বড় বড় বাণিজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার কর্মদক্ষতা। অথচ খাদ্য সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার পথে কিউবাকে নেতৃত্ব দিয়েছে ছোট ছোট কৃষকেরাই। আমরা বারবার শুনে থাকি যে খাদ্যাভাব দূর করার একমাত্র উপায় হল আর্ন্তজাতিক সহায়তা, কিন্তু স্থানীয় উৎপাদনের মধ্যেই কিউবা তার বিকল্প পন্থাকে আবিষ্কার করে নিয়েছে" (রসেট : ২০০০)। এটা স্বীকার করতে হবে যে ১৯৯০-র দশকে কিউবা যথেষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটচাও সত্যি যে, কিউবা প্রমাণ করতে পেরেছে যে অধীনতার ধারার-র তথাকথিত 'সংযোগচ্যুতি' (de-linking) যথেষ্ট সম্ভব। এখন প্রশ্ন এই যে, এই বিকল্প মডেল কি অন্যান্য নির্ভরশীল রাষ্ট্রের 'ব্লুপ্রিন্ট' বা ভবিষ্যত পরিকল্পনার নকশা হতে পারে ? বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করতে পারেন যে কিউবা ইতিমধ্যেই আধা-প্রান্তিক জায়গায় অবস্থান করছিল, কারণ সেখানকার উচ্চশিক্ষিত নাগরিকেরাই অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। নব্য মার্কসবাদীরা অবশ্য এর জন্য কৃতিত্ব দেন কিউবার তৎকালীন সামাজিক কাঠামোকে। এই প্রসঙ্গে এনরিকুয়েজ (২০০০) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চীন ও ভিয়েতনামের দিকে, যেখানে একই ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে, যদিও বা কিঞ্চিত ধীর গতিতে। তিনি বলেন যে সোভিয়েত জোটের দেশগুলি এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত কারণ সেখানে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা কাঠামোর আর অস্তিত্ব নেই। এনরিকুয়েজ আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত এই পরিবর্তনের উপর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, কারণ তা কিউবাতে শিল্প ও পুঁজি বিনিয়োগের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে এক ধরনের নির্ভরতার জায়গায় অন্য ধরনের (নব্য উদারপন্থী) নির্ভরতার প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি এবং এসম বিনিময়ের অবসান হয়েছিল।

নিজেদের অর্থনীতি সামলাতে যখন অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশগুলি একে একে তাদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছিল (অ্যানন : ২০০২), তখন কিউবা প্রমাণ করেছিল যে তার মত একটি তথাকথিত আধা-প্রান্তিক দেশও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। এই মুহূর্তে অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের

বেশিরভাগ দেশেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ও যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত নাগরিক নেই বা নব্য উদারতন্ত্রকে রুখতে তাদের উপরে কোনও মার্কিন নিষেধাজ্ঞাও নেই—কাজেই স্বাধীন উন্নয়নের জন্য কিউবাকে ঠিক এখনও 'ব্লুপ্রিন্ট' ভাবার সময় হয়নি। কিন্তু কিউবা অবশ্যই এই আশার জন্ম দেয় যে, মৌলিক ও সৃজনশীল উপায় খুঁজে নিয়ে নির্ভরতার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

২.৪ উপসংহার

আধুনিকীকরমের ধারার সুপারিশ করা উন্নয়নের নীতিগুলি সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় উন্নতিশীল দেশগুলির কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন তত্ত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। এই তত্ত্বগুলি বিশ্বকে কেন্দ্র ও প্রান্ত, এই দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বেছে নেয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। গোড়ার দিকের তাত্ত্বিকেরা নির্ভরাতেক সাধারণভাবে উপনিবশীকরণ ও অসম বিনিময়ের পরিণাম হিসাবে দেখতেন। পরের দিকের তাত্ত্বিকেরা প্রান্তিক দেশগুলির নির্ভরতার ঐতিহাসিক-কাঠামোগত চরিত্রের বিষয়টি অনুসন্ধান করেছেন, যাতে রাষ্ট্রীয় ও শ্রেণী সংঘাতের (কাজেই এক সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা) উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দৃঢ়ভাবে বলা হয়েএছ যে 'সহযোগী-নির্ভরশীল উন্নয়ন'-এর ('associated-dependent development') মাধ্যমে নির্ভরতা ও উন্নয়ন সহাবস্থান করতে পারে।

সারণি নং ঃ ১

নির্ভরতা তত্ত্বের পুরনো ও নতুন বক্তব্যগুলির তুলনা

	সনাতনী নির্ভরতা (classical dependency)	'নব্য' নির্ভরতা ('New' dependency)
সাদৃশ্য		
গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন	
বিশ্লেষণের স্তর	জাতীয়	
মূল ধারণা	কেন্দ্র-প্রান্ত নির্ভরতা	
নীতির ফলিতার্থ	নির্ভরতা উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর	
প্রভেদ		
অনুসৃত পদ্ধতি	বিমূর্তকরণ, নির্ভরতার সাধারণ নকশার উপর গুরুত্ব	ঐতিহাসিক-কাঠামোগত, নির্ভরতার নির্দিষ্ট রূপের উপর গুরুত্ব
মূল কারণ	বাইরের শক্তির উপর গুরুত্ব ঃ অক্ষম বিনিময়, উপনিবেশবাদ	অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর গুরুত্ব : শ্রেণির সংঘাত, রাষ্ট্র
নির্ভরতার প্রকৃতি	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক-সামাজিক
নির্ভরতা ও উন্নয়ন	পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র (নির্ভরতা শুধুমাত্র অল্পোন্নতির জন্ম দেয়)	সহাবস্থান সম্ভব (সহযোগী-নির্ভরশীল উন্নয়ন)

পরিশিষ্ট - ক

সারণি নং ঃ ক-১

নির্ভরতা ও বিশ্ব ব্যবস্থা দৃষ্টিকোণের তুলনা

	নির্ভরতা	বিশ্ব ব্যবস্থা
বিশ্লেষণের একক	জাতি-রাষ্ট্র	বিশ্ব ব্যবস্থা
অনুসৃত পদ্ধতি	কাঠামোগত-ঐতিহাসিক ঃ জাতিরাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা	বিশ্ব ব্যবস্থার ঐতিহাসিক চালিকা-শক্তি ঃ চক্রাকার ছন্দ ও ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঝোঁক
তাত্ত্বিক কাঠামো	দ্বিমাত্রিক ঃ কেন্দ্র-প্রান্ত	ত্রিমাত্রিক : কেন্দ্র-আধা-প্রান্ত-প্রান্ত
উন্নয়নের গতিমুখ	নিয়ন্ত্রণবাদী ঃ নির্ভরতা সাধারণত ক্ষতিকর	বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্ভাব্য ঊর্ধ্বগামিতা বা নিম্নগামিতা
গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু	প্রান্ত	প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র, আধা-প্রান্ত ও বিশ্ব অর্থনীতি

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ৩ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ ওয়ালারস্টেইনের ব্যাখ্যা

গঠন

৩.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ

৩.২ আঞ্চলিক শ্রেণি বিভাজন

৩.৩ বিকাশের পর্যায়

৩.৪ তাত্ত্বিক পুন ঃ স্মরণ

বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ

তাঁর 'The Modern World System : Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the sisteenth Century' গ্রন্থে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন আধুনিক পৃথিবীর উত্থানের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করার এক তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করেন। মূলত গণতান্ত্রিক চরিত্রের এক আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার জন্ম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের পরে, যা ১৪৫০ থেকে ১৬৭০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের আত্মপ্রকাশের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। ওয়ালারস্টেইনের মতে, তাঁর তত্ত্ব ওই সময়ের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বহি প্রকাশের এক সর্বাত্মক ছবি তুলে ধরতে সাহায্য করে ও বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এক নির্ভরযোগ্য, বিশ্লেষণধর্মী তুলনাকে সম্ভব করে তোলে।

মধ্যযুগীয় ভূমিকা ঃ ষোড়শ শতকের আগে পশ্চিম ইউরোপ যখন গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে পা বাড়ায়, তখন পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজে 'সামন্ততন্ত্র'-এর প্রাধান্য ছিল। ১১৫০ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে জনসংখ্যা ও বাণিজ্য, দুই-ই বেড়ে ওঠে। ১৩০০ থেকে ১৪৫০ সালের মধ্যে অবশ্য এই বৃদ্ধি থেমে যায় ও মারাত্মক এক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। ওয়ালারস্টেইনের মতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সংকটের কারণগুলি সম্ভবত এইরকম :

১। কৃষি উৎপাদন হ্রাস বায় বা এক জায়গায় স্থির হয়ে যায়। অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর বিস্তারের সঙ্গে কৃষি উৎপাদকদের কাঁধে বাড়তি বোঝার সৃষ্টি হয়।

২। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির চক্রাবর্ত (cycle) তার সবথেকে কাম্য স্তরে পৌঁছে যায়। পরে তা সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে।

৩। আবহাওয়া বা জলবায়ুসংক্রান্ত পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় ও জনগণের মধ্যে মহামারী বেড়ে ওঠে।

ইউরোপের নতুন শ্রম বিভাজন

ওয়ালারস্টেইনের বক্তব্য ল এই যে নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতেই ইউরোপ এক গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। অবশ্য এর জন্য আবশ্যক আলোচ্য বিশ্বটির ভৌগোলিক আয়তনের বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের শ্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রযন্ত্রগুলিকে তুলনামূলকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এই প্রথম জাতীয় বা অন্যান্য রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বের সিংহভাগকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। এই নতুন বিশ্ব অর্থনীতি আগেকার 'এমপায়ার' (empire), অর্থাৎ শিল্প-ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের থেকে পৃথক ছিল কারণ তার কোন এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। 'সাম্রাজ্য'-গুলি নির্ভরশীল ছিল এমন এক সরকারি ব্যবস্থার উপর, যা একচেটিয়া মালিকানার সঙ্গে শক্তিপ্রয়োগ মিশিয়ে অর্থনৈতিক সামগ্রীগুলিকে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে চালিত করত। এই 'সাম্রাজ্য'-গুলির নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমারেখা ছিল, যার ভিতরে আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। আধুনিক গণতন্ত্রের কলাকৌশলের মাধ্যমেই কেবল আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি কোন 'সাম্রাজ্য'-এর রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হয়।

এই নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল এক আর্ন্তজাতিক শ্রম বিভাজন, যা বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ শ্রম ব্যবস্থাও নির্ধারণ করত। এই মডেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ভর করত বিশ্ব অর্থনীতিতে সেই অঞ্চলের অবস্থানের উপর। তুলনামূলক ভিত্তি হিসাবে ওয়ালারস্টেইন চারটি পৃথক শ্রেণীর প্রস্তাব করেন—কেন্দ্রীয়, আধা-প্রান্তিক, প্রান্তিক ও বহিঃস্থ (external)—যাদের মধ্যে বিশ্বের সবকটি অঞ্চলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই শ্রেণিগুলি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিটি অঞ্চলের তুলনামূলক অবস্থানের পরিচয় দেয় এবং একই সঙ্গে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও অবহিত করে।

আঞ্চলিক শ্রেণি বিভাজন

(ক) কেন্দ্রীয় (core) : ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতিতে সবথেকে বেশি উপকৃত হয় কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি বড় অংশ (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড) কেন্দ্রীয় অঞ্চল হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, ইউরোপের এই অংশের রাষ্ট্রগুলি নিজেরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, ব্যাপক আমলাতন্ত্র ও বিশাল ভাড়াটে সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। এর ফলে স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিজেদের স্বার্থে এই বাণিজ্য থেকে উদ্বৃত্ত পুঁজি টেনে আনে। গ্রামীণ জনসংখ্যার বৃদধি ঘটলে, অল্প কিন্তু ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে থাকা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা খামার ও নির্মাণ শিল্পে শ্রমের যোগান দিতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সংকটের পরবর্তী সময়ে নগদ টাকার মাধ্যমে মজুর দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পরে কিছু স্বাধীন বা ছোট মা ারি

ভূস্বাম র উদ্ভব হলেও অন্যান্য বহু কৃষকই নিজেদের জমি হারাতে বাধ্য হয়। ই দরিদ্র কৃষকেরা প্রায়শই শহরে চলে আসতে থাকে এবং নগরভিত্তিক নির্মাণশিল্পে অল্প মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে থাকে। বাণিজ্য-সচেতন স্বাধীন কৃষকদের বঞ্চিত প্রভাব, যাজকতন্ত্রের (Pastoralism) উত্থান ও উন্নত প্রযুক্তির ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) **প্রান্তিক (Periphery) :** মানদন্ডের অন্য প্রান্তে অবস্থান প্রান্তিক অঞ্চলগুলির। কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার-বিহীন এই অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য রাষ্ট্র। এদের কাঁচামাল চলে যায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির হাতে ও এদের নির্ভর করতে হয় দমনমূলক শ্রমনীতির উপর। অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ককে কাজ লাগিয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি এই প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত পুঁজির বেশিরভাগ অংশই বেদখল করে নেয়। পূর্ব ইউরোপ (বিশেষ পোল্যান্ড) ও লাতিন আমেরিকাতে প্রান্তিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। পোল্যান্ড ইউরোপের বাকী অংশে গমের প্রধান রপ্তানিকারক হয়ে উঠলে রাজারা অভিজাত ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতা হারান। যথেষ্ট পরিমাণে সস্তা ও সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য শ্রমের সরবহার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূস্বামীরা তাদের বাণিজ্যিক জমিগুলিতে গ্রামীণ কৃষকদের জোর করে 'ক্রীতদাস'-দের মত কাজ করতে বাধ্য করেন। স্পেন ও পর্তুগালের লাতিন আমেরিকা অভিযান স্থানীয় কর্তৃত্বের কাঠামোগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে এবং তাদের জায়গায় ওই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক দুর্বল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 'হিস্পানিক' (Hispanic) বংশোদ্ভূত স্থানীয় শক্তিশালী ভূস্বামীরা অভিজাত, পুঁজিবাদী কৃষকে পরিণত হন। স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা, আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি, দমনমূলক শ্রমনীতি ও জোর করে খ নতে কাজ করানোর মাধ্যমে ইউরোপে সস্তায় কাঁচামাল রপ্তানি করা সম্ভব হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের থেকে এই দুই প্রান্তিক অঞ্চলের শ্রমব্যবস্থা পৃথক এই কারণে যে এখানে নিজেদের ব্যবহারের জন্য নয়, ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতির স্বার্থে পণ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, পূর্ব ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অভিজাত সম্প্রদায় বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ধনী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে সাহায্য আদায় করতে সক্ষম হয়।

(গ) **আধা-প্রান্তিক (semi-periphery) :** এই দুই চরম অবস্থানের মধ্যে রয়েছে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি, আবার তেমনই আছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে তুলনামূলক ভাবে উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছতে চাওয়া প্রান্তিক অঞ্চলগুলি। এরা প্রায়শই কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলির মাঝখানে থেকে 'বাফার'-এর (bueffer) ভূমিকা পালন করে। অধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে মোটের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় ক্ষমতাবান ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্কে এক চাপা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায়। আলোচ্য সময়ে যে সব ক্ষয়িষ্ণু বা পতনশীল কেন্দ্রীয় অঞ্চল আধা-প্রান্তিক অঞ্চলে পরিণত হয়, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল পর্তুগাল ও স্পেন। এই সময়ে অন্যান্য আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি ছিল ইতালি, দক্ষিণ জার্মানি ও দক্ষিণ ফ্রান্স।

অর্থনৈতিক ভাবে, আর্ন্তজাতিক ব্যাঙ্কিং বা উচ্চ মূল্যের ও উচ্চ মানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই

অঞ্চলগুলির ভূমিকা ছিল সীমিত এবং ক্রমশই নিম্নগামী। কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির মত এরা অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তেমনভাবে প্রাধআন্য বিস্তার করতে পারেনি এবং তার ফলে নিজেরা সেইরকম উপকৃতও হয়নি। এক দুর্বল গণতান্ত্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির ফলে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলের ভূস্বামীরা ভাগচাষের (sharecropping) দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর ফলে ভূস্বামীদের ফলন না হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং একই সময়ে তাঁরা জমি থেকে মুনাফা ও ভূস্বামীর মর্যাদা বা সম্মান উপভোগ করতে থাকেন।

ওয়ালারস্টেইনের মতে, এ কথা সত্যি যে আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি দ্বারা শোষিত হয়। কিন্তু এই আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলি নিজেরাই প্রায়শ প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে শোষণ করে, যার দৃষ্টান্ত হল স্পেন ও পর্তুগালের লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যগুলি। যেমন, দমনমূলক নীতির সাহায্যে স্পেন তা উপনিবেশগুলি থেকে সোনা ও রূপা আমদানি করে তার মোটা অংশই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলি কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্য ব্যবহার করত।

(ঘ) **বহিঃস্থ (external) :** এই অঞ্চলগুলি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিল, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির বাইরে থাকতে পেরেছিল। রাশিয়া এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পোল্যান্ডের পথে না গিয়ে রাশিয়া মূলত তার নিজস্ব বাজারের জন্য গম উৎপাদন করত। এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গেও রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল— অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই তার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়াও রুশ রাষ্ট্রের বিশাল শক্তি তাকে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করত ও বিদেশি বাণিজ্যিক প্রভাবকে সীমিত গন্ডিতে আবদ্ধ রাখত।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

বিকাশের পর্যায়

আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে ওঠে কয়েক শতাব্দী ধরে, যে সময়ের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি এই ব্যবস্থায় তাদের তুলনামূলক অবস্থানগুলি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে ওয়ালারস্টেইন চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এগুলিকে দুটি মূল পর্যায়ে বিভক্ত করব।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় :

এটি হল ১৪৫০-১৬৭০ সালের মধ্যে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থানের পরবর্তী সময়কাল। উদীয়মান বিশ্ব অর্থনীতিকে হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য এক বিশ্ব সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হলে, পশ্চিম ইউরোপের তৎকালীন সবকটি রাষ্ট্র এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে বেশীরভাগ রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য এই পদ্ধতিগুলির সাহায্য নেয় :

(ক) **আমলাতন্ত্রীকরণ :** এই প্রক্রিয়া রাজার সীমিত, অথচ বর্ধনশীল ক্ষমতার অনুকূলে কাজ করে। কর আদায় করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজারা প্রকৃতপক্ষে টাকা ধার নেওয়া ও ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রকে প্রসারিত করার ক্ষমতা বাড়িয়ে নেন। এই পর্যায়ের শেষে রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে

ওঠেন ও এক 'নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র'-এর (absolute monarchy) স্থাপনা করেন।

(খ) **স্থানীয় মানুষদের সমজাতীয় করে তোলা (Homogenization of the local population) :** নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে ও দেশীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দিতে বহু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বিতাড়িত করে। স্থানীয় মানুষ ও রীতিনীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত এই সব স্বাধীন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনের পথে বিপজ্জনক বাধা হিসাবে মনে করা হত। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন থেকে ইহুদীদের বিতালিত করা হয়। একইভাবে, প্রোটেস্টান্ট বণিকেরাও প্রায়শই ক্যাথলিক চার্চের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ত। ক্যাথলিক চার্চের মত এক বহুরাষ্ট্রীয় (transnational) প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের বিকাশ ও রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিকে বিপজ্জনক মনে করত।

(গ) কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রকে সমর্থন ও নতুন রাষ্ট্রকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রক্ষীবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছিল।

(ঘ) ওই সময়ে উদ্ভূত স্বৈরতন্ত্রের (absolutism) ধারণা রাজন্ত্রকে আগেকার প্রচলিত আইনকানুন থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত করেছিল। এই কারণে রাজা আগেকার সামন্ততান্ত্রিক আইনের হাত থেকে মুক্তি পান।

(ঙ) সর্বোচ্চ মুনাফা উপার্জন করতে ও স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে শক্তিশালী করে তুলতে অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে বহুমুখী করে তোলা হয়েছিল।

১৬৪০ সালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি এই উদীয়মান অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে তোলে। স্পেন ও উত্তর ইতালি আধা-প্রান্তিক স্তরে অবনীত হয়, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও আইবেরিয়ান (Iberian) আমেরিকা প্রান্তিক অঞ্চলে পরিণত হয়। ইংল্যান্ড ধীরস্থির ভবে কেন্দ্রীয় মর্যাদা পাবার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এই সময়ে ইউরোপে শ্রমিকদের মজুরি নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। মজুরি হ্রাসের ঘটনাটি ঘটে ইউরোপের বেশীরভাগ পুঁজিবাদের কেন্দ্রে। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় উত্তর ও মধ্য ইতালির শহরগুলিতে এবং ফ্ল্যান্ডাসে। এই ব্যতিক্রমের কারণ, এই শহরগুলি বাণিজ্যের পুরানো কেন্দ্র ছিল ও শ্রমিকেরা শক্তিশালী আর্ত-রাজনৈতিক গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল পরিমাণ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার মালিকদের ক্ষমতা শ্রমিকদের প্রতিরোধের সামনে ভেঙে পড়েছিল। ইতিমধ্যে লগ্নি করার জন্য বিশাল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমা করে ইউরোপের অন্যান্য অংশের মালিকশ্রেণী এই মজুরি হ্রাস থেকে মুনাফা করেছিল।

কোনও ছোট উচ্চস্থানীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে আমেরিকা বা প্রাচ্যের সঙ্গে দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্য খুবই লাভজনক ছিল—মুনাফার পরিমাণ দুশো থেকে তিনশো শতাংশ ছাড়িয়ে যেত। রাষ্ট্রীয় সহায়তা এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি ছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ নিতে পারত না। পরে অবশ্য অ তলান্তিক মহাসাগরের দু পারের এই বাণিজ্যের মুনাফা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে এবং ইউরোপে কৃষি ও

শিল্পের উপর বণিক বা ব্যবসায়ীদের কব্জা দৃঢ়তর হতে থাকে। ক্ষমতাশালী বণিকেরা উৎপাদনের আগেই সামগ্রী কিনে নিয়ে মুনাফা সঞ্চয় করতেন। পরে উৎপাদিত সম্পূর্ণ পণ্যগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বণিকেরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করতেন এবং আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। এই শক্তিশালী বণিক শ্রেণীই ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় (অষ্টাদশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়) :

এই সময়কালের বৈশিষ্ট্য হল কৃষি নয়, শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিকাশ। শিল্প উৎপাদন বেশী গুরুত্ব পেতে থাকায় এই সময়ে এইসব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় :

(ক) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সক্রিয়ভাবে নতুন নতুন বাজার খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে।

(খ) ভারত মহাসাগরীয় ব্যবস্থার মত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থাকে বর্ধনশীল ইউরোপীয় বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করার পরে এই অঞ্চলগুলি এবং আমেরিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে প্রবেশ করে। এশিয়া ও আফ্রিকা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে এই ব্যবস্থায় যোগ দেয়।

(গ) প্রান্তিক অঞ্চল হিসাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্তর্ভুক্তি আয়ত্তাধীন উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির মতো অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে তুলতে সক্ষম হয়।

(ঘ) এই পর্বে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি কৃষি ও শিল্পের এক মিশ্র ব্যবস্থা থেকে স্রেফ শিল্প ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে। ১৭০০ সালের আগে ইংল্যান্ড ছিল কৃষি ও শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ উৎপাদক। লক্ষ্য করা যায় যে ১৯০০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল।

(ঙ) ১৯০০ সালের মধ্যে যখন নির্মাণ শিল্প বেশী গুরুত্ব পেতে শুরু করে, তখন কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি প্রান্তিক ও আধা-প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে শিল্পের বিকাশকে উৎসাহ দিতে থাকে, যাতে তারা ওই অঞ্চলগুলিতে যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে পারে।

তাত্ত্বিক পুন স্মরণ (Theoretical reprise)

ওয়ালারস্টেইনের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি এক গতিশীল ব্যবস্থা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক বৈশিষ্ট্য অবশ্য অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই ব্যবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান চালালে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হল এর মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিই সবথেকে বেশী লাভবান হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রান্তিক (কোনও কোনও ক্ষেত্রে আধা-প্রান্তিক) অঞ্চলের কাঁচা মালের বিনিময়ে উৎপাদিত সম্পূর্ণ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বিশাল মুনাফা প্রান্তিক অর্থনীতির ক্ষতি করে কেন্দ্রকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। এর অর্থ এই নয় যে রে ফলে প্রান্তিক অঞ্চলের প্রত্যেকেই আরও দরিদ্র হয় বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রতিটি নাগরিকই আরও ধনী হয়ে ওঠে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রান্তিক অঞ্চলের ভূস্বামীরা দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করে ও শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়, কারণ ভূস্বামীরা শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বেশীরভাগ অংশই নিজেদের জন্য বেদখল করতে সমর্থ হয়। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে বহু ভূমিহীন গ্রামীণ কৃষক মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হয় ও তাদের জীবনযাত্রার মান ও আয়, দুই-ই হ্রাস পায় ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ওয়ালারস্টেইন পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশকে পৃথিবীর মানুষের এক বিরাট অংশের পক্ষে ক্ষতিকর হিসাবেই বিবেচনা করেছেন।

এই তত্ত্বের মাধ্যমে ওয়ালারস্টেইন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কেন বিশ্বের উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের পতনের পরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপকে এক প্রধান বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। ভৌগোলিক বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি যেখানেই প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শ্রমনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ব অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতির মধ্যে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে, কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তিক ও আধা প্রান্তিক অঞ্চলগুলির সম্পর্ক কিন্তু অপরিবর্তনশীল নয়, আপেক্ষিক রয়ে যায়। যেমন, প্রযুক্তিগত সুবিধা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রসার ঘটাতে পারে ও কয়েকটি প্রান্তিক বা আধা-প্রান্তিক অঞ্চলেও পরিবর্তন আনতে পারে। ওয়ালারস্টেইন অবশ্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার ইতিহাস প্রমাণ করে য তা এক তির্যক বিকাশের জন্ম দিয়েছে, যা সকলের মঙ্গল করার বদলে বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অর্থনৈকি ও সামাজিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

পর্যায় ঃ চতুর্থ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ১ ভারতের দলব্যবস্থার বিবর্তন ও বিকাশ

গঠন

১.১ সূচনা

সূচনা

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের দলব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিবর্তনের উৎসমুখ খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতের বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যে। রজনী কোঠারি ও মরিস জোনসের মতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে আধিপত্যমূলক দলব্যবস্থা বা dominant party system-এর উদ্ভব হয়। এই সময় বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল একচ্ছত্র ও অবিংসবাদিত। বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে এই একদলীয় প্রাধান্যকে সমালোচকগণ 'paradox of single dominant party system within multipartysm' আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের দলীয় ব্যবস্থার চরিত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করবার জন্য সর্বাগ্রে তার বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(ক) ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রক্রিয়া ঃ

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ভারতে একদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলব্যবস্থার সহাবস্থান পরিলক্ষিত হলে এইসময় বিরোধী দলগুলির ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত কারণ সংসদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে তারা কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে অসমর্থ হয়েছিল এবং রাজ্যস্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটগঠন করে ক্ষমতা ভাগ করতেও তারা সক্ষম হয়নি। এই সময় অবশ্য এক অর্থে বিরোধী দলগুলির ভূমিকার একটা গঠনমূলক চরিত্র ছিল কারণ তারা কেবলমাত্র বাধাদানের জন্য কংগ্রেসের পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেনি।

গঠনতান্ত্রিক সমালোচনার মধ্যেই নিজেদের বিরোধিতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। রজনী কোঠারির মতে এই সময় কংগ্রেস ি ল 'party of consensus' এবং বিরোধী দলগুলি ছিল 'parties of pressure.'

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের এক বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। ই প্রথম আটটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় স্তরে মোট আসনের মাত্র ৫৪% অর্জন করতে সমর্থ হয়। কোঠারির মতে "Congress dominance was diminished because its performance in the art of Government was subjected to harsh judgement by supporters and opposition alike." এই পর্যায়ে কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় খুবই প্রকট হয়ে ওঠে এবং সমালোচকেরা একে 'de-institutionalization of the Congress' বলে অভিহিত

করেছেন। এর অন্যতম কারণ ছিল প্রধানত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের দলীয় সংগঠন পরিচালনার নীতি। তিনি বহু ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করতেন এবং এই সময় ভারতীয় রাজনীতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক রূপ ধারণ করে। এর ফলে সর্বভারতীয়স্তরে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে। এই পর্যায় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির গুণগত রূপান্তর সূচিত হতে থাকে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং শ্রীমতী গান্ধি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনারায়ণের কাছে ৫৫,০০০ ভোটে পরাজিত হন। এই নির্বাচনের আগে থেকেই ভারতব্যাপী যে ইন্দিরাবিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তা ছিল তাঁর পরিবার পরিকল্পনাকে বলপূর্ব্বক কার্যকরী করার নীতি, তদুপরি জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস এবং সর্বোপরি লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ করে রাখার ফলশ্রুতি। শেষপর্যন্ত ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনতা দল কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং কংগ্রেসের একাধিপত্য বা hegemony চূর্ণ হয়ে যায়। এই নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু জনতাদলের নীতি বা মতাদর্শের জয়ের নির্দেশক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কংগ্রেস ঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে দেশের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ। জনতাদলের মেয়াদ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই দল ছিল নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্বে আকীর্ণ এবং তার নেতৃত্বের ভিত্তি যেমন শক্তিশালী ছিল না। ১৯৮০ সালে জনতা সরকারের পতন ঘটে এবং ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সালের পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকান্ডের পর তার পুত্র রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার পিছনে যে প্রধান কারণ ছিল নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি। তাছাড়া এই সময় জাতীয় সংহতির সংকট বিশেষভাবে অনুভূত হয় বিশেষত পাঞ্জাবের রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসবাদ ও আসাম ও গোর্খাল্যান্ডের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। এক অর্থে ১৯৮৪ সালের নির্বাচন পূর্বের নির্বাচনগুলির থেকে পৃথক কারণ ইতিপূর্বে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল বিশেষ ঘটনা বা issue based election' ছিল না। সমালোচকের ভাষায় 'it was decided at the level of anxieties images and symbols.' আশির দশক থেকে ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভি িতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস তখনো কেন্দ্রীয় সংসদে তার প্রাধান্য বজায় রেখেছিল এবং বহু রাজ্য বিধানসভাতেও তার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, কিন্তু সংসদের বাইরে তার আধিপত্য সংশয়াতীতভাবে খর্ব হয়েছিল।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক বিন্যাসের পর্যালোচনা করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে এইসময় আঞ্চলিক বহুদলীয় ব্যবস্থা (region-based multi-party system) ভারতে কায়েম হয়। নব্বইয়ের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভারতীয় জনতা পার্টির (বি. জে. পি) অভ্যুদয়। ১৯৮৯ সালে লোকসভায় বি.জে.পি'র সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ৮৬, কিন্তু ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯।

ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গামঞ্চে বি.জে.পি'র আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল প্রকৃতপক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে বি.জে.পি নিজেকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সফল হয়েছিল। পরিসংখ্যান এইকথাই প্রমাণ করে যে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে বি.জে.পি'র জনসমর্থনের ভিত্তি সম্প্রসারিত হয় এবং ১৯৯১ সালে এই দল ও নতুন ভোটদাতাদের (১৮ থেকে ২১ বছর বয়সী) ২৭.৩% ভোট অর্জনে সক্ষম হয়।

পাশাপাশি কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে তার আধিপত্য হারাতে থাকে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে তার জনসমর্থনের হার ৫০% থেকে কমে ৪০% এর নীচে নেমে যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই ক্ষমতায় আসে। এইসময় একের পর এক কেলেঙ্কারির সঙ্গে কংগ্রেসের নাম যুক্ত হয় যার ফলে জনসাধারণের চোখে তার ভাবমূর্তির অবনমন ঘটে।

১৯৯৬ সালে বি. জে. পি. যখন সর্বপ্রথম ক্ষমতায় আসে তখন যুক্তফ্রন্টের যোগদান না করেও কংগ্রেস বি.জে.পি-কে অপসারণের জন্য তাকে সমর্থন করে ফলে ১৩ দিনের মাথায় অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত বি.জে.পি সরকারের পতন হয়। এরপর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নীতিগত বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে, ফলে ১৯৯৮ সালে দেবগৌড়া সরকারের পতন হয়। এই সময় বি.জে.পি দেবগৌড়া সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে ভোট দিয়েছিল যদিও কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সঙ্গে। সম্ভবত ১৩ দিনের মাথায় অপসারণের তিক্তস্মৃতি তার মনে জাগরুক ছিল।

১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে বি.জে.পি সংসদে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সারে নির্বাচনে তার ভরাডুবি ঘটে এবং কংগ্রেস দীর্ঘকাল পরে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কংগ্রেসের এই প্রত্যাবর্তন কিন্তু তাঁর পূর্বের একাধিপত্যের পুনঃস্থাপনের পরিচায়ক নয় কারণ বর্তমান U.D.F সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি ফলে তার hegemonic status পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আঞ্চলিক দলগলির সমর্থনের উপর কংগ্রেস আজ অনেকাংশে নির্ভরশীল। নব্বইয়ের দশক থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রকট হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রিকরণ বা federalization ঘটেছে। অদীতি দে শর্মার মতে আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের তুলনায় ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা পৃথক ও স্বতন্ত্র। কারণ সেখানে জাতীয় স্তরে কোন আঞ্চলিক দলের প্রভাব এত বৃহৎ নয়। ভারতে কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরের দলগুলির সমর্থনের কাঠামো অঞ্চলভিত্তিক। এই যুক্তরাষ্ট্রিকৃত বহুদলীয় ব্যবস্থা নতুন সহস্রাব্দে আরো জোরদার হবে। কারণ বর্তমানে আঞ্চলিক রাজনীতি বহুলাংশে জাতীয় রাজনীতির নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের ভূমিকার উপরেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৮৮ সালে জনমোর্চা, জনতা, ডি.এম.কে, তেলেগু দেশম, লোকদল (বি), কংগ্রেস (এস) ও অসম গণপরিষদকে নিয়ে ন্যাশনাল ফ্রন্টের গঠন হয়। এর মধ্যে বামফ্রন্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের

নেতৃত্বে কোনো ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তবে ১৯৯১ সালে তার পতন ঘটে। ১৯৯৫-এর পর থেকে তেলেগু দেশম, জনতা দল ও বামফ্রন্ট তৃতীয়ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করে প্রধানত অকংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির সমাবেশের মাধ্যমে। তবে আঞ্চলিক দলগুলির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে মতাদর্শগত বিরোধ তৃতীয় ফ্রন্টের বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় বি.জে.পি. বিরোধিতা।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর বি.জে.পি অপসারণের পিছনে জাতীয়ফ্রন্ট-বামফ্রন্টের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং ২০০৪ সালের নির্বাচনেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতির বিকল্প শক্তিরূপে তৃতীয় ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয় কারণ কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করাই এই ফ্রন্টের নীতিগত অবস্থান। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে ইতিপূর্বে বি.জে.পি.'র সঙ্গে জাতীয় ফ্রন্টের ঐক্য ঘটেছিল রাজীব গান্ধি সরকার অপসারণের তাগিদে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা ভবিষ্যতে তেমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করবে কিনা তা ভবিষ্যতেই প্রমাণিত হবে।

(খ) ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও মতাদর্শ ঃ

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে দেওয়া আবশ্যক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিটি ইস্তেহারে ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সংখ্যালঘু শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ, ভূমিসংস্কার, সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয় ঐক্য, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, দারিদ্র অপসারণ প্রমুখ লক্ষ্যসাধনের প্রতি অবিচল আনুগত্য ব্যক্ত করেছে। ১৯৮৯ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছিল 'secularism is the bedrock of our nationhood, the core of our value system. Religion and politics must be separated' মতাদর্শগতভাবে কংগ্রেস সাম্যবাদের প্রতি তার আস্থা ব্যক্ত করেছে। উপরোক্ত ইস্তেহারে বলা হয়েছিল 'our socialism is neither dogmatic nor borrowed from abroad. It is an authentic Indian idelogy deriving from the experience of history and the realities of soceity' কংগ্রেসের সাম্যবাদী আদর্শের স্তম্ভ হল জনগণের ক্ষমতায়ন অর্থাৎ Peoples power। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরদার করে তোলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়াসের কথা কংগ্রেসের প্রতিটি নির্বাচনী ইস্তেহারে ব্যক্ত হয়েছে।

বি.জে.পি তার ঊষালগ্ন থেকেই হিন্দুত্ববাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও আদর্শের সার্থক সমন্বয়ের দ্বারা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কথা (cultural nationalism) বি.জে.পি ধারাবাহিকভাবে বলে এসেছে। বি.জে.পি ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার (Positive secularism) পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ঐতিহাসিলক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। অচিন বিনায়ক তাঁর 'The Painful Transition' গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন 'The openly pro-Hindu idelogy of the B.J.P puts it outside the pale of left and secular front perspective. The Congress may have communal elements and may sometimes engage in communal politics but it is not fundamentally communal while the B.J.P. R. S. S. is.

বি.জে.পি নির্বাচনী ইস্তেহারগুলিতে যে উদ্দেশ্যগুলি অগ্রাধিকার পেয়েছে তা হল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়ের পথের বাধা অপসারণ এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৪ সালে গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে চীনের ভারত আক্রমণকে কেন্দ্র করে সি.পি.আই ও সি. পি. আই.এমেরে মধ্যে বিভাজন ঘটে। মতাদর্শগতভাবে উভয়েই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করেছে, তবে সি. পি. আই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নৈকট্য বজায় রেখেছিল পক্ষান্তরে সি. পি. এম সোভিয়েত ও প্রজাতন্ত্রী চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমদূরত্ব রক্ষা করেছিল। সত্তরের দশকে কংগ্রেসের সঙ্গে ,সি. পি. আই- ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি তবে আশির দশকে উভয় দলের ঐক্যের প্রশ্ন উঠেছিল যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সি. পি. আই অবশ্য বামফ্রন্টে অন্যতম শরিক। এছাড়াও রয়েছে রেভেলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর এস পি) ও ফরওয়ার্ড ব্লক। সি. পি. এম ও সি. পি. আইন উভয়ের নির্বাচনী ইস্তেহারগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে যে উভয় দলেই ভারি শিল্পের জাতীয়করণ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, আয়বৈষম্যের অবসান, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাদের অবিচল আত্মনিয়োগ প্রকাশ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাদের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে এই দুই দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কোথায় ? এ বিষয়ে অচিন বিনায়কের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য— 'The basic historical features of Indian communism, have been functionalism split and convergence, but not re-unification.

(গ) ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের প্রভাব ঃ

আঞ্চলিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করে এস. এল. সিক্রি বলছেন 'Regional parties are those which generally and exclusively operate withinn limited area or which represent the interests of particular lingustic ethnic or cultrual groups.' সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় এই দলগুলির সামাজিক ভিত্তি অনেক সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে ও এ. আই. এ. ডি. এম কে, পাঞ্জাবের আকালি দল, জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স, আসামের অসম গণপরিষদ, অন্ধ প্রদেশের তেলেগু দেশম প্রমুখ আঞ্চলিক দলগুলির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কেবলমাত্র আঞ্চলিক দাবিদাওয়া চরিতার্থ করার মধ্যে এই দলগুলির ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা কেন্দ্রীয়স্তরে মন্ত্রসভা গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলি এক স্বতন্ত্র গুরুত্ব অর্জন করে এবং নব্বইয়ের বেশি লোকসভা আসন দখল করে যা জনতাদল ও সি. পি. এমের অর্জিত সর্বমোট আসন সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়। সাতটি রাজ্যে তারা এককভাবে অথবা অন্যান্য সমমতাবলম্বী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যান্য রাজ্যে তারা প্রধান বিরোধীদলের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা এবং আঞ্চলিক বাস্তব সম্পর্কে সর্বভারতীয় দলগুলির উদাসীনতা আঞ্চলিকতাবাদকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যসরকারের এলাকায় কেন্দ্রীয়

সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আঞ্চলিকতাবাদকে ইন্ধন জুগিয়েছে। অমিতাভ রায়ের মতে ষাটের দশকের দেশভাগ থেকে কংগ্রেসের অবক্ষয় আঞ্চলিক দলগুলির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কংগ্রেস যতদিন আঞ্চলিক স্বার্থগুলিকে নিজের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে অধিগ্রহণ করতে সমর্থ ছিল, ততদিন আঞ্চলিকতাবাদের উন্মেষ ঘটেনি, কিন্তু সত্তরের দশকের শুরু থেকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীকৃত নেতৃত্ব আঞ্চলিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। আসাম আন্দোলনের সময় বে-আইনি অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেসের নিস্পৃহতায় বিষয়টি বিশেষভাবে ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা আঞ্চলিকতাবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। Paul Brass যথার্থই বলেছেন 'statistics reveal that the inequalities that had been there among the states in the pre-independence period, peristed even after it'. এইভাবেই বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি স্তরে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে অগ্রাধিকার পেয়েছে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী স্বার্থ। Paul Brass মন্তব্য করেছেন, 'there is virtual unanimity among scholars who have analyzed inter-regional resource transfers have not only been able to prevent the increasing gap between the rich and poor states, but may also have contributed to accentuating the disparties, আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন Robert Stern। তাঁর মতে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে প্রাদেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বিশেষত কৃষক শ্রেণির মধ্যে। সবুজ বিপ্লব ও কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যিকরণের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় অর্থনীতির উপর। প্রাদেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়স্তরে বাজারের দখল নেওয়ার জন্য অনেকক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণেও আঞ্চলিকতার প্রসার বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আঞ্চলিক নেতারা যার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। কোন বিশেষ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় জনগ্রসরতা আঞ্চলিক দলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি আন্দোলন। কে পি পি বা কামতাপুর পিপলস পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন স্পষ্টতই রাষ্ট্রবিরোধী হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন। এই আঞ্চলিকতাবাদের পিছনে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কারণ যেমন ছিল, একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল অত্যন্ত গভীর।

বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের ভূমিকা বহুমাত্রিক। যেহেতু ভারতীয় রাজনীতির পালাবদলের সাথে সাথে জোট রাজনীতির বা Coalition Politics এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, সেই সূত্রে আঞ্চলিক দলের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভর করে আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনের উপর। সর্বভারতীয় দলগুলিও এদিক দিয়ে স্বনির্ভর নয়। ভারতীয় রাজনীতির যুক্তরাষ্ট্রিকরণের যে প্রক্রিয়ার কথা সমালোচকরা বলে থাকেন, তাকে পরমুখাপেক্ষী রাজনীতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সর্বভারতীয় দলগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে কিনা যে প্রশ্নটিও আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সামগ্রিক বিচারে আগমী দিনে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে, বিশেষত জোট গঠনের ক্ষেত্রে, একথা মনে হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত।

(ঘ) ভারতীয় দলব্যবস্থা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় রাজনীতি ক্রমশঃ বহুদলীয় ব্যবস্থার এক নূতন রূপধারণ করতে চলেছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল বি.জে.পি কি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে ? বি.জে.পি'র সামনে এখন বিরাট মতাদর্শগত সংকট। আর এস এস (রাষ্ট্রিয় স্বয়ংসেবক সংঘ) ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ ক্রমাগত বি.জে.পি'র ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তাদের নির্দেশিত হিন্দুত্বের পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য যা স্পষ্টতই উগ্র হিন্দুত্বের পথ। বিজেপি'র কর্ণধার লালকৃষ্ণ আদবানি জানিয়েছেন যে বিজেপি অনুসৃত হিন্দুত্ববাদের নির্যাস হল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও অন্তর্নিহিত মানবতাবাদ। এখানেই আর. এস. এসের সঙ্গে বিজেপি'র মতাদর্শগত পার্থক্য। আদবানির কাছে হিন্দুত্ব হল জীবনযাপনের নীতি পক্ষান্তরে আর.এস.এসের কাছে তা হল রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার দর্শন। বিজেপি'র নমনীয় হিন্দুত্ববাদের নীতি তার অন্য দুই শরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় বিজেপি আর এস এসের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে কিনা তা কৌতূহলের বিষয়।

বামফ্রন্টের ভূমিকা সাম্প্রতিককালে যেনতেন প্রকারে বি.জে.পিকে প্রতিরোধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়, কিন্তু দীর্ঘ বিতর্কের পরে সি.পি.এম পলিটব্যুরো এই প্রস্তাবকে নাকচ করে যা পরবর্তীকালে 'ঐতিহাসিক ভ্রান্তি' রূপে বিবেচিত হয়েছে। এর পরে বামফ্রন্ট সর্বভারতীয়স্তরে ক্ষমতা দখল করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্তমানে কিন্তু বামফ্রন্ট কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ব্যাপারেই অধিক আগ্রহী। ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী দল হিসাবেই বামফ্রন্ট নিজের অস্তিত্বকে তুলে ধরতে চাইছে। তৃতীয় ফ্রন্টের ধারণার বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই যদিও পরিবর্তনশীল রাজনীতিতে ভবিষ্যত কোন্ দিকে মোড় নেবে তা জল্পনার বিষয়। বামফ্রন্ট স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিজোট গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে তার মতাদর্শগত বিরোধ গৌণ হয়ে গিয়েছে। সামগ্রিক বিচারে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় রাজনীতিতে কোন দলই বিশেষ কোন মতাদর্শকে অনির্দিষ্টকাল আশ্রয় করে থাকতে পারে না এবং রাজনৈতিক কারণে মতাদর্শগত বিরোধকে তুচ্ছ করে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস (alignment and realignment of political forces) ঘটে। এখানে ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

(ঙ) সারাংশ ঃ

ভারতের দলব্যবস্থা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল বহুদলীয় ব্যবস্থা খাতায় কলমে বিদ্যমান থাকলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত। সাম্প্রাতিককালে নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে জোটরাজনীতি বা Coalition

Politics ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের দলব্যবস্থআর চরিত্রগত পরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, তা উপরোক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) কোন বছরের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাধান্য খর্ব হয় ?

(খ) ভারতের কোন রাজনৈতিক দল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ?

(গ) ভারতের যে কোন তিনটি আঞ্চলিক দলের নাম উল্লেখ করুন।

২। নীচের প্রশ্নগুলির রচনাধর্মী উত্তর দিন ঃ

(ক) ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য কি ছিল ?

(খ) দলীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীকরণ বলতে কি বোঝায় ?

(গ) বি.জে.পি'র হিন্দুত্ববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ?

৩। ২৫০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদের উন্মেষ কিভাবে ঘটেছিল ?

(খ) ভারতীয় দলব্যবস্তায় বামপন্থী দলগুলির ভূমিকার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

(গ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতাদর্শ ও কর্মসূচি সক্ষেপে আলোচনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ১.৪

ক। Ramesh thakur, The Government and politics of India, Macmillan Press limited, 1995.

খ। Rakhahari Chatterji, ed Politics India, The state soceity interface, South Asian Publishers, New Delhi, 2001.

একক ২ ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও জনগণের ক্ষমতা

গঠন

২১ সূচনা

২.২ ভারতের নির্বাচন কমিশন

২.৩ মূল্যায়ন

২.৪ অনুশীলনী

সূচনা

যে কোন গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হল নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতি অনেকাংশে নির্বাচন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল থাকে কারণ জনগণের ভোটের দ্বারাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং যে কোন রাজনৈতিক দলের শাসনের বৈধতা জনসমর্থনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত হল নির্বাচন ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নির্বাচন যদি পরিচালিত না হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাখহরি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'If the representatives fail to keen their promise, or do things that are morally questionable, if not outright immoral, or engage in activities which are manifestly subversive of any commonsense notion of public interest, then fife years must be considered too long a term to bear with them.' এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে নির্বাচন চলাকালীন যদি অসাধু ও অসৎ পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহলে নির্বাচনের পরবর্তীকালে তার সম্প্রসারিত রূপ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্বাচনের বৈধতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক এবং এখানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রাতিককালে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিদগ্ধমহলে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং কমিশনের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পুনর্মূল্যায়নের আবশ্যকতা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বিপুলভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এধরনের নতুন চিন্তাভাবনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ সাম্প্রতিককালে ভারতীয় রাজনীতি নানাবিধ কলুষের দ্বারা সমীলিপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রকাশ রাজনৈতিক জীবনের নানাস্তরে ঘটে চলেছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'In Indian politics today, the greatest challenge comes from the unholy nexus between politics business and the under world. The money-mafia axis is unscrupulously used by the politicians in their quest for political power.' স্বাধীনতার আগে মহাত্মা গান্ধী নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত রাখার

ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নির্বাচন প্রার্থীদের নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ মানুষ হতে হবে এবং তাঁদের পদের মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। গান্ধী এমনকি নির্বাচনী তদ্বির ও প্রচারেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ছিল স্পষ্টতই আদর্শবাদী। বর্তমানে ভারতবর্ষে গান্ধির প্রত্যাশা যে পূরণ হয়নি তা বলাই বাহুল্য তবে নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টি গভীরভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। কোন কাল্পনিক ধারণা বা Utopia-কে গ্রহণ না করে বাস্তবানুগ প্রণালীতে নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিশোধন অবশ্যই সম্ভব।

ভারতের নির্বাচন কমিশন

সংবিধানের ৩২৪(২) ধারা অনুসারে 'The Election Commission shall consist of a Chief Election Commissioner and such other commissioners as the president may from time to time, fix.' প্রথমে মুখ্যনির্বাচনী অধিকর্তা ছাড়া আর কোন কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৬-১০-৮৯ রাজীব গান্ধি সরকার দুজন কমিশনারকে নিয়োগ করে কমিশনকে multimember commission-এ রূপান্তরিত করে। এর পর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের জাতীয় ফ্রন্ট সরকার কমিশনকে তার পুরানো রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু ভারতের নরসিমা রাও সরকার পুনরায় এম এস গিল ও জি. কৃষ্ণমূর্তিকে কমিশনাররূপে নিয়োগ করে।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত এই কমিশন বা ভোটার তালিকা বা electoral roll তৈরি করে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ও জনসাধারণকে সে সম্পর্কে অবহিত করা কমিশনের অন্যতম কাজ। যদি কোথাও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয়েছে বলে কমিশন সন্দেহ করে তাহলে সেখানে কমিশন পুনরায় ভোটগ্রহণের ডাক দিতে পারে। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচনী অধিকর্তা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজনৈতিক দলগুলির জন্য আচরণবিধি তৈরি করা। এছাড়া প্রার্থীর নির্বাচনী অর্থব্যয়ের হিসাব কমিশনের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ বা সমস্যার কথা মুখ্য নির্বাচন অধিকর্তাকে জানাতে পারেন এবং কোন প্রার্থীর যোগ্যতা যদি সংশয়ের উর্ধ্বে না থাকে তা হলে তাকে লোকসভা বা বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন অধিকর্তা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্নগুলি কমিশনের দ্বারাই বিতরিত হয়।

নির্বাচন কমিশন যে আদর্শ আচরণবিধি বা Model Code of Conduct তৈরি করেছে তার প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, কোন রাজনৈতিক দল কোন বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার মারতে বা slogan লিখতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক প্রচারের জন্য কোন সরকারি বাড়ি ব্যবহার করা যাবে

না। নির্বাচনের দায়িত্বে যে Officer-দের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে স্থানান্তরিত করা যাবে না। কোন মন্ত্রীকে নির্বাচনী বুথে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না যদি না তিনি নিজে প্রার্থী বা অন্য কোন প্রার্থীর agent হন। এছাড়া নির্বাচনী মিছিল বার করতে হলে পুলিশকে তার সময়সীমা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং যানজট সমস্যা যাতে না দেখা দেয় সে বিষয়ে যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ১-৪-৯৬ সুপ্রীমকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা প্রদান করে যাতে করে অর্থের অপব্যবহার না হয়। এই রায় অনুসারে ৭-৪-৯৬ নির্বাচন কমিশন Chief Electoral Officer, রাজস্ব সচিব ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাজে নির্দেশনামা পাঠায় যার প্রধান অংশগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের হিসাব দাখিল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের Bank Balance সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বিবৃতি পেশ করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক প্রার্থীর অর্থব্যয়ের বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ সমীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা Chief Election Commissioner নির্বাচন কমিশনের শীর্ষে অবস্থান করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে নরসিমা রাও সরকার দুজন কমিশনারকে নিয়োগ করার পর মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক কি তাঁদের সমান ক্ষমতা ভোগ করেন নাকি তাঁদের তুলনায় তাঁর পদমর্যাদা অধিক ? ভারতের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক টি. এন. শেষণ নরসিমা সরকারের উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সকে সুপ্রীম কোর্টে challenge করেন। কোর্ট তার রায়ে বলে যে নির্বাচন আধিকারিককে অন্য দুজন কমিশনারের সমপর্যায়ভুক্ত করা। ইতিপূর্বে কিন্তু S. S. Dhawan vs Union of India and others মামলায় সুপ্রীম কোর্ট তার রায় দিয়ে বলেছিল "The Election Commissioners cannot be equated with the Chief Election Commissioner and that the latter is not the first among equals but above the former in view of the constitutional scheme of Article 324 of the Constitution.

টি এন শেষণের বিভিন্ন কার্যকলাপ মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিকের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি করে। শেষণ ছিলেন নানা দিক দিয়ে এক ব্যতিক্রমী আধিকারিক যিনি নির্বাচনী সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পরিশোধন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরই সঙ্গে তাঁর কর্মপদ্ধতি অনেকেরই তীব্র সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯১ সালে শেষ নির্বাচনকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পিছিয়েছেন যখন সমগ্র দেশ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি (কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত) সম্পর্কে তাঁর দাবি না মেটা পর্যন্ত সমস্ত উপনির্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে শেষণ এক আদেশ জারি করে মন্ত্রী রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাঁদের agent-দের ভোটের দিন গাড়ি ব্যবহারকে সঙ্কুচিত করেন। তিনি আরো বলেন যে যতদিন না ভোটারদের মধ্যে photo identity card বিতরণ করা হচ্ছে ততদিন নির্বাচন হবে না। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষণ ১৯৬৮ সালের Election Symbols Order-কে সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনের হাতে কোন রাজনৈতিক দল বিধিভঙ্গ করলে তাকে স্বীকৃতি প্রদান না করার অধিকার আরোপ

করতে উদ্যোগী হন। মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের বিরুদ্ধে শেষণ নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনেন এবং মে মাসে উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচন স্থগিত রাখেন কারণ মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব সরকারি হেলিকপ্টার নির্বাচনী প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি যে রাজনৈতিক দলগুলির বিরাগভাজন হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তারা অভিযোগ করে যে নির্বাচন কমিশন নিজেকে 'Super Government'-এ পরিণত করতে চাইছে। শেষণ তাঁর সাংবিধানিক অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করছেন এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করছেন, এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রীম কোর্ট শেষণকে ভর্ৎসনা করে এবং নির্দেশ দেয় যে কোন রাজ্যসরকার যদি নির্বাচন চলাকালীন নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে সেক্ষেত্রে শেষণ যেন সুপ্রীম কোর্টের মতামত অনুসারে কাজ করেন। এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার তাঁর নেই। এ প্রসঙ্গে অবশ্য কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শেষণ জনমানসে রেখাপাত করতে স ম হয়েছিলেন এবং একসময় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল ও বিরাট। এর কারণ সহজে অনুমেয়। ভারতের আপামর জনসাধারণ শেষণকে দেখেছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকরূপে। ইতিপূর্বে নির্বাচনে নানাবিধ অসাধুতা ও অনৈতিকতা তাদের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এর ফলে ক্ষেত্র বিশেষে শেষণের অতিসক্রিয়তা কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্ত হলেও জনসাধারণের মধ্যে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি কারণ রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করার যে প্রয়াসে শেষণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাকে সাধারণভাবে ভারতের মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল। দ্বিতীয়ত একথা অনস্বীকার্য যে শেষণ মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিকের পদকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিলেন যা ছিল নজিরবিহীন। শেষণের কর্মপদ্ধতি ছিল অবশ্যই একনায়কতান্ত্রিক, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং আজও নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণের অবকাশ আছে।

(খ) ভারতে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ঃ

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রসঙ্গটি বহুলালোচিত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সাধারণ নির্বাচনের শেষে তার নির্বাচনী প্রতিবেদনের মাধ্যমে নির্বাচনী আইন ও পদ্ধতি সংশোধনের প্রস্তাব আনতো। ১৯৭০ সালের আগে কিন্তু নির্বাচনী আইনের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়নি।

১৯৭০ সালে নির্বাচন কমিশন এ সম্পর্কে একটি বিলের খসড়া করে এবং সংসদের জয়েন্ট কমিটি বিলে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৭৩ সালে লোকসভায় বিল পেশ করে। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে সংসদ ভেঙে যাওয়ায় বিলটি কার্যকরী হয়নি তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত বিলের জয়েন্ট কমিটির অনুমোদিত নির্বাচন কমিশনের আনেকগুলি প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছিল। এরপর ১৯৭৭ সালে নির্বাচন কমিশনের সমস্ত প্রস্তাবগুলির পর্যালোচনা হয় এবং তার কিছু নতুন প্রস্তাব সংযোজনের মাধ্যমে ২২-১০-৭৭ কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচনী সংস্কারের বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠানো হয়। আশির দশক থেকেই এই প্রস্তাবগুলি পর্যালোচিত ও বিশ্লেষিত

হয়ে এসেছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ।

প্রথমত, ভোটাধিকারের বয়সকে ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলির নথিকরণ বা registration বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া বুথ দখলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বাতিল করে দেবার অধিকার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। পরন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যমেয়াদ ও শর্তাবলী সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সমতুল্য বলে ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমাও বাড়ানো হয়েছে।

প্রথমত, ভোটাধিকারের বয়সকে ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলির নথিকরণ বা registration বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া বুথ দখলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বাতিল করে দোবর অধিকার নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যমেয়াদ ও শর্তাবলী সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সমতুল্য বলে ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমাও বাড়ানো হয়েছে।

১৯৯০ সালে দীনেশ গোস্বামী কমিটি নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কিত যে প্রতিবেদন পেশ করে তার কয়েকটি প্রস্তাব পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে। প্রথমত, স্বাধীন ও স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয়ত নির্বাচন কমিশন যেন কোনভাবেই আইন বিভাগের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গো টি এন শেষণের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। শেষণ নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাতন্ত্র্যকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলেও সরকারের সঙ্গো তাঁর যে তীব্র সংঘাত বাধে, তা কিন্তু স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ রাজনীতির নজির স্থাপন করেনি। একই সঙ্গো শেষণের প্রস্তাবগুলির প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অনস্বীকার্য। তাঁর 'The Regeneration of India', গ্রন্থে শেষণ বলেছেন যে প্রত্যেক প্রার্থীকে তাঁর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দাখিল করতেই হবে। ভারতের নির্বাচনী ব্যবসথার নৈতিক অবনমনের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন 'The entire system of elections these days, has been reduced to hte application fo illegal power which is based on cash, corruption and criminalty or muscle power and ministerial power and abuse of office.' অসাধুতা ও অপকীর্তির দায়ে প্রার্থীদের অভিযুক্ত করার জন্য শেষণ Special Election Court-এর সুপারিশ করেছেন। তিনি একবার বলেছেন যে দোষী সাব্যস্ত হলে কোন প্রার্থীকে ভবিষ্যতে নির্বাচনে প্রতিদ্বি করার অধিকার না দেওয়া উচিত। এছাড়া যদি কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আদালতে উত্থাপিত হয়ে থাকে, তাহলে যেন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়তে না পারেন। প্রস্তাবগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই তবে যদিও সংবিধান পর্যালোচনার জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি নির্বাচনী সংস্কারের কথা উ খিত করেছে। এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত পথনির্দেশ তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। নতুন সহস্রাব্দের ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত কিন্তু বহুলাংশে নির্ভর করবে নির্বাচনী সংস্কারের সার্থকতার উপর। প্রতিষ্ঠানের স্তরে বিচ্ছিন্ন কিছু সংস্কার গণতন্ত্রকে বিশ্বাসযোগ্যতাকে দিতে অপারগ। তাছাড়া অশোক মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে কেবলমাত্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। একথা সত্য যে সাধারণ মানুষের নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহ

নির্বাচন কমিশনের মত প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্রের যাথার্থ্যকে প্রমাণ করে কিন্তু মানুষ যদি তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয় তাহলে কিন্তু কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে না। এখানেই সভ্যসমাজ বা Civil Soceity-র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রতীয়মান হয়।

মূল্যায়ন

(গ) জনগণের ক্ষমতা—স্বপ্ন ও বাস্তব ঃ

জনগণের সার্বভৌমিকতা হল গণতন্ত্রের প্রধান স্মারকচিহ্ন। জনগণ যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সম্যকভাবে সচেতন না হয় তাহলে রাষ্ট্রীয়স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এ বিষয়ে অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'In the final analysis, democracy demands for its success, a high ethical preparation of the people.' সাধারণ মানুষ নির্বাচনী সংস্কারের প্রত্যক্ষভাবে কতটা সামিল হতে পারেন, তা নির্ভর করে তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার ওপর। এ বিষয়ে রাখহরি চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'The argument that the ordinary citizens are ill-equipped for political activities compared to professional politicians need not deter us. It is imperative that ways of direct participation of the public in decision making must be devised.' সাম্প্রতিককালে ভারতে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের সময় জনমানসে ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নানাবিধ জোরজবরদস্তির দ্বারা সাধারণ মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আচরণ করতে বাধ্য করে ফলে নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে না। এর ফলে গণতন্ত্র তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হারিয়ে ফেলে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সাধারণ সভ্য সমাজ বা Civil Soceity নির্বাচনী সংস্কারের ব্যাপারে কতটা অগ্রণী হয়েছে সংক্ষেপে তার ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। 90'র দশকে কর্ণাটকে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে নির্বাচনী সমীক্ষকের দল তৈরি হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তা ছিল সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিমন্ডল সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ০২-০৫-০২ সুপ্রিম কোর্টে এক যুগান্তকারী রায় দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে মনোনয়ন পত্র দাখিলের আগে মুচলেকা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয় যার দ্বারা তাঁদের সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেও বিবৃতি দিতে হবে। ২১টি রাজনৈতিক দল ৮-৭-০২ একত্রিত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের বিরোধিতা করে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত মুচলেকার বিষয়টি সুকৌশলে বাদ দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই যাঁরা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা জনগণের ক্ষমতায়নের বিরোধী ছিলেন। এইসময় কিন্তু সাধারণ মানুষের উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা এক ভারতব্যাপী নির্বাচনী সংস্কার আন্দোলনের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। গুজরাটে Election Watch Committee গড়ে ওঠে যার প্রধান কাজ ছিল ভোটদাতাদের নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের সমপের্ক প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করা। জনগণের সরকারি কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকার অধিকার বা Right to Information-কে প্রকারান্তরে বাস্তবায়িত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। দিল্লী ও রাজস্থানেও অনুরূপভাবে Election Watch গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাধারণ সমাজ ও

বেসরকারি সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে Election Watch গড়ে ওঠে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে এবং ভোটার তালিকাকে যাচাই করে বহু কারচুপিকে উন্মোচিত করেছে।

সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠানের (Civil Society Organization বা C.S.O) উদ্যোগের দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ২০০৪ সালের নির্বাচনে ভারতের ২০টি রাজ্য election watch-এর আয়োজন করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহারাষ্ট্রের AGNI, অন্ধ্রপ্রদেশের লোকসভা, রাজস্থানের মজদুর ও কিষাণশক্তি সংগঠন, মধ্যপ্রদেশের সাধন, বাঙ্গালোরের জনগ্রহ ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ সমাজ বা Civil society'-র অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ. বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভা নিরন্তর চাপসৃষ্টি করে রাজনৈতিক দলগুলিকে অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত প্রার্থীদের মনোনয়ন না দিতে বাধ্য করে। অ প্রদেশে এই ধরনের ৫১ জন প্রার্থীকে চিহ্নিত করা হয়। রাজস্থানের মজদুর ও কিষাণ শক্তি সংগঠন ট্রাকযাত্রার মাধ্যমে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায়। মুম্বাইয়ে AGNI'র ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

(ঘ) নির্বাচনী সংস্কার কোন পথে ?

ভারতে নির্বাচনী সংস্কার কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও আইনগত প্রণালীর ওপর নির্ভর করতে ক্রমশ জনমুখী হচ্ছে যা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বিনা নির্বাচনী সংস্কার অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। Justice Venkatchaliah বলেছেন 'Civil society as a pillar of democracy, should work on collaboration with bureaucarcy, parliament, judiciary and media.' অবশ্য একথাও সত্য যে C.S.O গুলির পক্ষে এককভাবে কাজ করা সহজ নয় এবং গণমাধ্যম, সুপ্রীম কোর্ট প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সাম্প্রতিককালে বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা বা Civil society activism-এর যে উন্মেষ ভারতীয় রাজনীতিতে ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং এই নতুন ধারার সম্প্রসারণ বিতর্কের সৃষ্টি করতে বাধ্য। তথাপি এছাড়া গণতন্ত্র সংরক্ষণের কোন বিকল্প পথ নেই। নির্বাচন কমিশনকেও এখানে সর্বতোভাবে সাধারণ সমাজের পাশে দাঁড়াতে হবে। নির্বাচনী সংস্কার যদিও যৌথ উদ্যোগের ফলশ্রুতি, তবু মুখ্য দায়িত্ব সাধারণ মানুষকেই নিতে হবে কারণ মানুষ হল গণতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতের কোন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার নির্বাচনী সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ?

(খ) ভারতের সংবিধানের কোন ধারায় নির্বাচন কমিশনের গঠনের উল্লেখ আছে।

(গ) দীনেশ গোস্বামী কমিটি কোন সালে তার প্রতিবেদন পেশ করে ?

২। **নীচের প্রশ্নগুলির রচনাধর্মী উত্তর দিন ঃ**

(ক) টি এন শেষণ কী ধরনের নির্বাচনী সংস্কারের ওপর গুরত্ব আরোপ করেছিলেন ?

(খ) নির্বাচন কমিশন প্রবর্তিত আদর্শ আচরণ বিধি বলতে কি বোঝায় ?

(গ) মুখ্যনির্বাচন কমিশনারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। **২৫০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ**

(ক) ভারতে নির্বাচনী সংস্কার কতখানি কার্যকরী হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

(খ) নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(গ) নির্বাচনী সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কী জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে।

৪। **গ্রন্থপঞ্জি ঃ**

(ক) T. N. Seshan, The Regeneration of Idnai, Vikign 1995

(খ) 1995 West Bengal Political Science Association souvenir.

Ashok K. Mukhopadhyay, Eletoral Press and Indian Politics

Rakhahari Chatterji, Electgoral Politics—Saving also people from their representatives.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৫। সারাংশ ঃ

ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। তবে সংগঠিতভাবে এই উদ্যোগকে গণআন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়নি। নির্বাচন ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের বিজয়কে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রকে কতখানি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে, উক্ত প্রবন্ধে তা আলোচিত হয়েছে।

একক ৩ ভারতের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

গঠন

৩.১ সূচনা

৩.২ মূল্যায়ন ও উপসংহার

৩.৩ সারাংশ

৩.৪ অনুশীলনী

৩.৫ গ্রন্থপঞ্জী

সূচনা

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল চাপসৃষ্টিকারী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব। এই ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানাপ্রকার স্বার্থগত সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে না কিন্তু নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নিজেদের কার্যকলাপ চালাতে সচেষ্ট হয়। গ্রেট ব্রিটেনের তুলনায় ভারতের স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীগুলি সুসংগঠিত নয় যদিও তারা সরকারের নানাবিধ কাঠামোর মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকাও বিকেন্দ্রীকৃত হতে বাধ্য।

(ক) ভারতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকার স্তরবিন্যাস ঃ

ভারতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের সংহতিসা ন ও প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্নস্তরে নিজেদের কার্যাকলী পরিচালনা করে। গোষ্ঠীবিক্ষোভ প্রদর্শন এবং নানা প্রকার হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। এখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গূরূত্বপূর্ণ, অর্থাৎ পরিবার, বিদ্যালয়, আঞ্চলিক ও সামাজিক সম্পর্কের যথোচিত সদ্ব্যবহার। সচরাচর অসংগঠিত গোষ্ঠী এই সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। মতামত গঠন সম্পর্কিত সমীক্ষায় একথাই প্রতীয়মান হয়েছে যে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বক্তব্য পেশ করে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে। কোন বিশেষ গো র পৃষ্ঠপোষক বা নির্দল মনোভাবপন্ন কোন ব্যক্তির দ্বারা আইনসভায় বিশেষ স্বার্থের অনুকুলে বক্তব্য পেশ করেও এই বক্তব্যকে কার্যকরী করা যায়। আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গণসংযোগের মাধ্যম, রাজনৈতিক দল, আইনসভা, মন্ত্রিপরিষদ, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এছাড়া আইনসভায় যেহেতু বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন সেইজন্য

তাঁদের মাধ্যমে গোষ্ঠীর পক্ষে শাসনবিভাগকে প্রভাবিত করা সহজ নয়। lobbying অর্থাৎ ব্যক্তিগত আবেদন, আর্থিক লেনদেন প্রমুখ পদ্ধতিগুলি সুপরিচিত তবে সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি ছিল আইনসভার বিভিন্ন কমিটির নিকট বক্তব্য পেশ অথবা ব্যক্তিগতভাবে আইনসভার সদস্যদের নিকট বক্তব্য নিবেদনের মাধ্যমে তাদের নিজ স্বার্থের অনুকুলে নিয়ে আসা। ভারতে শিল্পপতি, চাষী এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংগঠন এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। ভারতে যদিও বিচারবিভাগীয় স্তরে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ব্যাপক, প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নেই, তথাপি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টে সরকারি নির্দেশ, আইন এবং চুক্তির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন এবং এই কারণে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগতভাবে কোন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সদস্য সরকারি আইনের নির্দেশ এবং আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সম্পর্কে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর আর সি কুপার সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করেন এবং সুপ্রীমকোর্ট সেই অর্ডিন্যান্সকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন।

(খ) ভারতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ঃ

ভারতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পর্যালোচনা করলে তার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হবে। প্রথমত, ভারতে বহু পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী আছে এবং কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের স্থায়ী আনুগত্য নেই। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। দ্বিতীয়ত, ভারতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে একধরনের দ্বৈত রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিকতা সম্পন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থানও পরিলক্ষিত হয়। সব ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অহিংস ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে না এবং বহুসময় তারা হিংসাশ্রয়ী পন্থা অবলম্বন করে। ইউরোপের উন্নত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে কার্যাবলী পরিচালনা করে না। বিভিন্ন বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতার উপর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে নির্ভর করতে হয়। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি কিন্তু সমজাতীয় নয়। কোন কোন গোষ্ঠী বিশেষ লক্ষ্য পূরে র জন্য গঠিত হয় এবং প্রতিতুলনায় অন্যান্য গোষ্ঠীর স্থায়ী চরিত্র থাকে, বিশেষত ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সংঘের ক্ষেত্রে। অস্থায়ী গোষ্ঠীগুলি কিন্তু তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধানের সাথে সাথেই অবলুপ্তির পথে চলে যায়। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় সামাজিক জাতিগত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গোষ্ঠী আছে। কেরালার নায়ার সার্বিস সোসাইটি একটি জাতভিত্তিক গোষ্ঠী, মুসলিম লিগ একটি ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠী এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত উপজাতীয় গোষ্ঠী। ভারতে কিছু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জাতীয় পর্যায়ে কার্য পরিচালনা করে, অন্যান্যেরা আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার ভেদরেখাকে মুছে ফেলার উপক্রম করে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও মুসলিম লিগ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(গ) ভারতের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ঃ

ভারতের মত উদারনৈতিক গণতন্ত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজের বিভিন্ন অংশ ও পেশার সঙ্গে

যুক্ত মানুষের স্বার্থ সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয়। এখানে স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী সংবাদ ও তথ্য প্রদান ও সংগ্রহের অন্যতম উৎসরূপে প্রতিভাত হয়। তারা আইনসভার সদস্য, সাধারণ মানুষ, আমলা এবং প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়েও তথ্য সরবরাহ করে। জনসাধারে র কাছে বক্তব্য উপ াপনের মাধ্যমেও তারা জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এছাড়া তাদের সংযোগ সাধনের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। গণসংযোগের মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জনসাধারণের কাছে নিজের দাবির যৌক্তিকতা পেশ ও সরকারের জনস্বার্থের পরিপন্থী নীতির সমালোচনা করে। তারা সরকারের পক্ষেও প্রচার কার্য চালায়। ভারতে বহু শিক্ষক সংগঠন আছে যারা শিক্ষকদের দাবিদাওয়া ও সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া শিক্ষানীতির পরিবর্ত, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়েও তারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। যে সমস্ত সংগঠন শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তারা সরকারি নীতির অনুকূলে প্রচারকার্য চালায়। ক্ষেত্রবিশেষে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারে উপদেষ্টার ভূমিকাও গ্রহণ করে। নির্বাচনী রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের উে শ্য তাদের থাকে না কিন্তু তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তাদের সদস্যবৃন্দ রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হতে পারেন। ভারতে শ্রমিক সংঘ, কিষাণ সভা, শিক্ষক সংগঠন প্রভৃতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তখন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকার পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) ভারতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ

ভারতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠী হল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। এর অন্যতম কারণ হিসাবে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে মননশীল আলোচনা করেছেন Stanley Kochanek, Helen Lamb এবং Bernard Brown।

স্বাধীনতার পূর্বে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলন বা ইংরেজ শাসনের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেনি। নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তারা নিজেদের নীতি স্থির করেছিল। ক্ষেত্রবিশেষে তারা উভয়কেই সমর্থন করেছে। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের উপর ঘনশ্যামদাস বিড়লা ও যমুনালাল বাজাজের প্রভাব সর্বজনবিদিত। গান্ধির সঙ্গে বিড়লার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বর্তমান ভারতেও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

১৮৩৪ সালে Calcutta Chambers of commerce স্থাপিত হয়। ১৯০৭ ও ১৯০৯ সালে যথাক্রমে বোম্বাই ও মাদ্রাজে The Indian Merchants Chamber এবং Southern Indian Chamber of Commerce গঠিত হয়। এছাড়া মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত Chamber of Commerce পরবর্তীকালে Indian Chamber of Commerce নামে পরিচিত হয়। এছাড়াও Bengal National Chamber of Commerce স্থাপিত হয় যা পরে Oriental Chamber of Commerce-এ পরিবর্তিত হয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংগঠনরূপে Federation of Indian Chambers of Commerce সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। Stanley Kochanek-এর মতে এই FICCI'র মূল উদ্দেশ্য হলো

সরকারি নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা। বিভিন্ন সরকারি উপদেষ্টা কমিটিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও এই সংস্থা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। ১৯২৭ সালে FICCI-এর গোড়পত্তন হয়।

ভারতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয়স্তরেই প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকে। এছাড়া বহু রাজ্যসরকার সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোগের সাথে যৌথ উদ্যোগ গঠনে উৎসাহী হওয়ায় রাজ্যস্তরেও সংগঠিত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বেই স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৫ সালে কোকনদে প্রথম Indian Chamber of Commerce প্রতিষ্ঠিত হয়, পরবর্তীকালে যার নামকরণ করা হয় Godavari Chamber of Commerce। যে ব্যবসায়ীরা ছিলেন বিদেশি পুঁজির দালাল, তাঁরা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সামিল হন নি। Bengal National Chamber-এর সঙ্গে প্রথম থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। এই সংগঠন থেকে কংগ্রেসের অধিবেশনে সদস্য পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য পশ্চিমভারতের কলের মালিকেরা স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। গান্ধীর আবির্ভাবের পর থেকে ব্যবসায়ী মহলে এক দ্বৈত মনোভাবের সূচনা হয়। অনেক ব্যবসায়ী গান্ধির গণআন্দোলনকে সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করে অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আবার তাদের অন্য এক অংশ মনে করেছিলেন যে গণসংগঠনগুলির মধ্যে যদি সংগ্রামমুখী প্রগতিবাদী ধারার ব্যাপক প্রসার ও বিস্তার ঘটে তাহলে তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের অপর একটি অংশ সরকারি contact-এর ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে জাতীয় সংগ্রামে সামিল হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৩৫ সালের পরে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকে কংগ্রেস মেনে নেওয়ার পর থেকেই জাতীয় আন্দোলনে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মূলত বিড়লার প্রভাবে গান্ধি ১৯৩৭ সালে বাঙলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বা Coalition Ministry'র বিরোধিতা করেন এবং এই প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তার গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়।

গান্ধির সঙ্গে বিড়লার ঘনিষ্ঠতার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ২০-০৪-৩৬ পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে লেখা বিড়লার চিঠি থেকে যেখানে তিনি লেখেন মহাত্মাজী কথা রেখেছেন এবং একটি শব্দও উচ্চারণ না করে দেখেছেন যাতে কোন নতুন বামপন্থী কর্মসূচি না গৃহীত হয়। জহরলালের বক্তৃতা একদিকে দিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কারণ যতগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সবই তাঁর বক্তৃতার পরিপন্থী। স্বাধীনতার পরেও বিড়লার প্রভাব কত ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ১ মিলিয়ন অর্থসাহায্য পেয়েছিল টাটা ও বিড়লার কাছ থেকে। এর পূর্বে ১৯৫৬ সালে বিড়লা মন্তব্য করেন যে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী কর্মসূচির প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। যে কথা এখানে অনুক্ত ছিল তা হল এই যে বিড়লা বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেস শেষপর্যন্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাহায্যের ওপর নির্ভর করবে এবং প্রকৃত সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবে না। নেহরুর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক

পুনর্গঠন অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ওপর বাধানিষেধ আরোপের ফলে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতে সংগঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এভাবেই স্বতন্ত্রপার্টির উদ্ভব হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন রাজাগোপালচারী, মিনুমাসানী প্রমূখ। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এইদল বিরাট সাফল্য অর্জন করলেে তার সমর্থন প্রধানত মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

কংগ্রেস শাসনকালে বৃহৎ শিল্পপতিদের পুঁজি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিড়লা, থাপার ও রিলায়েন্স গোষ্ঠী ৭০ ও ৮০'র দশকে কংগ্রেসের সার্বিক আনুগত্য অর্জন করেছে। প্রতিতুলনায় টাটা, মফতলাল, বম্বে ডাইং, বাজাজ গোষ্ঠী প্রমুখ অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে ঘোষিত জরুরি অবস্থা চলাকালীন টাটা ও গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী ইন্দিরা গান্ধিকে সমর্থন করেনি। সামগ্রিক বিচারে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্পপতিদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পরিকল্পিত, অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসার প্রভৃতি বিড়লা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, কারণ এই গোষ্ঠী নিশ্চিতভাবে জানত যে কংগ্রেস কখনো সংগঠিত শিল্পপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবে না। টাটা গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপেই পরিকল্পিত অর্থনীতি, শিল্পনীতি, কোম্পানির আয়ের উপর ধার্য কর, license প্রদানরীতি ইত্যাদির বিরোধী ছিল। জি. আর. ডি টাটা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও কিন্তু টাটা গোষ্ঠী কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে সর্বাধিক অর্থসাহায্য করেছে। এখানে স্পষ্টতই প্রাক স্বাধীনতা যুগের সঙ্গে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের একধরনের নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। সর্দার প্যাটেল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একান্ত সুহৃদ ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই গোষ্ঠী জহরলাল নেহরুর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। কেন্দ্রস্তরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা করেছিল কারণ শাসকদলের সমর্থন ব্যবতীত ভারতে ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক দলকে আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যাপকভাবে সরকারি আনুকূল্যে অর্জন করেছে। ব্যবসায়ীদের চাপে সরকার উদার আমদানি নীতি প্রণয়ন করেছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়, দীর্ঘমেয়াদি রাজস্বনীতি গ্রহণ, সার এবং খনিজ তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে আহ্বান জানান ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সাহায্য করেছে। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থসাহয্য করে তাই জন্য তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। এর ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কালো টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে. কংগ্রেস সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস হল ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য। ১৯৬৯ সালে রাজনৈতিক দলকে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দ্বারা আর্থিক সাহায্য দানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলেও তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থশক্তি বা money power এর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ব্যক্তি রাজ্য আইনসভা ও সংসদে নির্বাচিত হন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের পর্যায়েও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এই গোষ্ঠী lobbyist-এর সাহায্যও গ্রহণ করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কম রীদের কথা

উল্লেখ্য। এরা শিল্পপতিদের সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কথা উল্লেখ্য। এরা শিল্পপতিদের পক্ষ থেকেই সরকারকে প্রভাবিত করে থাকে। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে lobbyist-রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি বিশেষ কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপনে বা বৈরিতার মধ্যে নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে উৎসাহী হন এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলা থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের ক্রিয়াকলাপকে বিস্তৃত করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Organized Business in India' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন 'As business constitues an important constitutent element of soceity, it is only natural that it gets involved in politics. In this, business is concerned with political stability as well as political change. One thing can be sid with certanity, that business does not want any polticial change which is not conducive to the fulfilment of its own interests.'

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠী ছাড়া শ্রমিক সংঘের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে শ্রমিকসংঘের দীর্ঘ ইতিহাস সুবিদিত। জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরাধীন ভারতে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাক জন্য শ্রমিক সংঘ গঠিত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে শ্রমিক সংঘের গঠন ও কার্যপরিচালনায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রতিটি শ্রমিক সংঘই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনে গঠিত হয়েছে। Indian National Trade Union Congess (I.N.T.U.C) All India Trade Union Congres (A.I.T.U.C), Centre of Indian Trade Unions (C.I.T.U). ইত্যাদি কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনের উদাহরণ। এই সংগঠনগুলি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলন পরিচালনা করে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয়স্তরে নিজেদের কার্যাবলী পরিচালিত করে। তারা শ্রমিকবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয় আবার বেসরাকরি সংস্থার জাতীয়করণের সপক্ষেও দাবি পেশ করে। শ্রমিক সংঘগুলি রাজ্য আইনসভা ও সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণ করে যাঁরা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। শ্রমিক বিরোধী Essential Service Maintenance Act (E.S.M.A) প্রণয়নের সময় বামপন্থী দলগুলি তীব্র বিরোধিতা করে। এছাড়া মন্ত্রী পর্যায়েও শ্রমিক সংঘের প্রভাব পরিস্ফুট হয়। তাদের প্রতিনিধিবর্গ রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার সময় নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন।

প্রতিটি শ্রমিক সংঘ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দল শ্রমিক সংঘ গঠনে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়। শ্রমিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল কেবল নিজের মতাদর্শ, কর্মসূচি ও বক্তব্যই প্রচার করে না, এই সংঘ হল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শক্তি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের শ্রমিকশাখা থাকে যারা সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। শ্রমিক সংঘ রাজনৈতিক সামাদিকীকরণের অন্যতম কেন্দ্র। সদস্যসমূহের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন শ্রমিক সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সংগঠনের মত শ্রমিক সংঘের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরস্পর পরিপূরকের সম্পর্ক বিদ্যমান। রাজনৈতিক দল আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল থাকে। অপরদিকে রাজনৈতিক দলের সমর্থন ব্যতীত শ্রমিক সংঘের পক্ষে এককভাবে তাদের দাবি আদায় করা সম্ভব নয়।

এবিষয়ে অধ্যাপক রাখহরি চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'Political unionism in India is the product of the fact that most central trade unions, to whoch the bulk of the individual unions are affiliated, are sponsored by and actively associated with political parties.' তিনি আরো লিখেছেন 'Trade Unionism in India becomes political because all central unions along with economic objectives and bread and butte rissues, also adopte political objectives and progremmes. Nearly all central unions in India have political objectives,' শ্রমিকসংঘ ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আরো লিখেছেন 'The Trade Unions found in the political parties a source for steady flow of leaders and activities as well for guidance and political influence. Central trade unions became the trade union fronts of political parties marking a phase of intensely politicized trade unionism.' ভারতের অন্যান্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে কৃষক সংগঠন (কংগ্রেসের All India Kisan Cogress, C.P.I.(M)-এর কিষাণসভা প্রমুখ)। ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সংঘের ন্যায় এরাও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া রয়েছে ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠন। এই সংগঠনগুলি যদিও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুক্ত সকলেই পৃষ্ঠপোষিত রাজনৈতিক দলের সমর্থন নয়। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে S.F.I., ছাত্র পরিষদ, D.S.O প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক দলের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল ছাত্র ও যুব সংগঠনকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে সামিল করা। পরিভাষায় একেই বলে political indoctrination স্বাধীনতার পূর্বে ছাত্র আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সুভাষচন্দ্রের মত নেতা যিনি ছাত্রাবস্থায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন নিগ্রহের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সঞ্চারের কথা বার বার বলেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতে ছাত্রসংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই ভূমিকা হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। ঘেরাও, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বহু ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর রাজনীতির পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। Trade Union আন্দোলনের মতো ছাত্র সংগঠনগুলিও নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ পথকে পরিহার করে হিংসাত্মক প্রণালীর শরণ নিয়েছে। এর ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। ভারতের ছাত্র সংগঠনগুলির রাজনৈতিক দলের সমর্থনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। তাদের কোন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নেই কারণ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় তাদের থাকতে হয়। এর ফলে তাদের মতাদর্শগত বুনিয়াদ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।

মূল্যায়ন ও উপসংহার

ভারতের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী একটি স্বীকৃত সাংগঠনিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কোন স্বতন্ত্র নেই কারণ কোন না কোন রাজনৈতিক দলের

আশ্রয়পুষ্ট হয়ে তাদের কাজ করতে হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তাদের ভূমিকা স্বাধীন বা autonomous নয়। তথাপি রাজনৈতিক বনে তাদের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়। যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্ট হয়ে যায় তখন অবশ্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর চরিত্রের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় একধরনের তাৎক্ষণিক স্বাতন্ত্র্য তাদের মধ্যে প্রতিভাত হয়। তবে সামগ্রিক বিচারে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা রাজনৈতিক দলের সহযোগী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে রাজনৈতিক দলও কিন্তু সেই অর্থে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয়, কারণ তাকেও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। এদিক দিয়ে তাদের সম্পর্ক অনেকটা পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যক্ষয়ী সম্পর্কের মতো কারণ উভয়েই স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে। এই সম্পর্ক প্রকৃত অর্থে পরস্পরের পরিপূরকের সমধর্মী কি না, তা নিয়ে মননশীল বিচার ও বিশ্লেষণের অবকাশ আছে।

সারাংশ

ভারতে স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ভূমিকা রাজনৈতিক রঙ্গামঞ্চে পরিলক্ষিত হয়। এই গোষ্ঠীগুলি নানা স্তরে ক্রিয়াশীল থাকে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিজ প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের চরিত্র ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য থাকলেও তাদের সম্পর্ক অনেকাংশে পরস্পরের পরিপূরকের। উক্ত প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতের যে কোন দুটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করুন।

(খ) ভারতের যে কোন একটি শ্রমিক সংঘের নাম উল্লেখ করুন।

(গ) কোন সালে Calcutta Chamber of Commerce প্রতিষ্ঠিত হয় ?

২। নীচের প্রশ্নগুলির রচনাধর্মী উত্তর দিন ঃ

(ক) ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কোন কোন স্তরে নিজ প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয় ?

(খ) শ্রমিক সংঘের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(গ) স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী হিসাবে ছাত্র সংগঠনের ভূমিকার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৩। ২৫০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

(খ) স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী হিসাবে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(গ) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে ?

গ্রন্থপঞ্জী

(1) Stanley Kochanek, Business and Politics in India, University of California Press, Berkeley, 1974.

(2) Claude Merkovitz, Indian Business and Nationalise Politics; The Indigenous Capitalise class and the Rise of the Congress Party.

Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

(3) Rakhahari Chatterjee, Unions, Politics and the State, South Asian Publishers, New Delhi, 1980.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ৪ ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের বিবর্তনের ইতিহাস

গঠন

৪.১ সূচনা

৪.২ মূল্যায়ন

৪.৩ সারাংশ

৪.৪ অনুশীলনী

সূচনা

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কেবলমাত্র তাত্ত্বিক স্তরে নয় রাজনৈতিক জীবনে তার প্রয়োগগত দিকটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে বিশ্লেষণ ও আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ সমাজে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা (Local self-government) স্বাধীনতার পূর্বে মহাত্মা গান্ধি, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখের লেখনীর মধ্যে বিবৃত হয়েছিল। পঞ্চায়েতীরাজের ধারণা এদেশে নতুন কিছু নয়। প্রাচীনভারতে আঞ্চলিক স্তরে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশেষত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি ও মহাভারতের মধ্যে। ব্রিটিশ আমলে লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে গান্ধি তাঁর গ্রামস্বরাজ দর্শনের মাধ্যমে যে বাণী প্রচার করেন তা হল এই যে প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের উন্মেষ সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ঘটা উচিত। এ বিষয়ে সংবিধানের রূপকার ডঃ ভীমরাও আম্বেদকারের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে কারণ আম্বেদকারের মতে আঞ্চলিক স্তরের সরকারগুলি আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে যার ফলে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, সংকীর্ণতা ও কূপমন্ডুকতার প্রসার ঘটবে। স্বাধীনতার পূর্বে জহরলাল নেহরু গান্ধির একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই তিনি গান্ধির গ্রামস্বরাজের ধারণাকে নাকচ করেন। অবশ্য ভারতে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেহরুর বিশিষ্ট অবদান ছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে পঞ্চায়েতী রাজের প্রবর্তন ছিল নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক ঘটনা। তার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ—

১। গ্রামীণ স্তরে গণতন্ত্রের ভিত্তির সম্প্রসারণ।

২। গণতন্ত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের পথকে প্রশস্ত করে সাধারণ মানুষকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা।

৩। গ্রামের মানুষকে নিজেদের কাজ নিজে করে নেওয়ার ব্যাপারে উপযোগী করে তোলা।

৪। গ্রামের মানুষের মধ্যে পরিকল্পনা চেতনার উন্মেষ ঘটানো যার মাধ্যমে লোকবল ও অন্যান্য অব্যবহৃত সম্পদের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার সম্ভব।

৫। গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, কর্মোদ্যোগ ও একতা সঞ্চারিত করা।

৬। গ্রামীণ জনসমাজের পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অংশকে গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া।

৭। গ্রামের মানুষের চেতনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের দ্বারা গ্রামে নতুন চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশের উপযোগী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা।

(ক) ভারতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা বিবর্তনের প্রেক্ষাপট ঃ

পঞ্চাশের দশকে ত্রিস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (Three tier system) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে কার্যকরী করার জন্য যে তিনটি স্তরে পঞ্চায়েতী রাজের স্তরবিন্যাসের কথা বলেছিলেন তা হল যথাক্রমে গ্রামপঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। মেহতা কমিটির প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্রকে গ্রামের সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে উপরোক্ত কমিটির প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হয়। নেহরুর মৃত্যুর পর পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানা রকম আঘাত নেমে আসে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে (১৯৬৭-৭৭) তারা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এরপর ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা সরকারের পতনের পর জনতা সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, এবং অশোক মেহতা কমিটি গঠিত হয় যার প্রতিবেদনে ১৯৭৮ সালে পেশ করা হয়। এই কমিটি দ্বিস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতী রাজের প্রস্তাব করে (two-tier system) যার প্রধান অঙ্গ ছিল জেলাপরিষদ ও মন্ডল পঞ্চায়েত।

পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে এই কমিটির কয়েকটি সুপারিশকে কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছিল যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি উপেক্ষিত হয়। কর্ণাটকে চারটি স্তরে পঞ্চায়েতী রাজকে ভাগ করা হয়—জেলা পরিষদ, মন্ডল পঞ্চায়েত, তালুক পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম সভা। ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ হয় যেখানে স্পষ্টভাবে ত্রিস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী কর্ণাটকে নতুন পঞ্চায়েতী রাজ আইন পাশ হয় যা ১০-৫-৯৩ থেকে বলবৎ হয়। কেরালাতেও বিধানসভায় অনুরূপ আইন পাশ হয় ২২-৫-৯৪, তবে কোরালায় পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমলাতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, যার ফলে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপ্তি অনেকাংশে খর্ব হয়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল চরিত্রগতভাবে পৃথক। বিশের দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রিয়াশীল ছিল, বিশেষত ইউনিয়ন বোর্ড। পশ্চিমবঙ্গে চতুর্স্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতী রাজ বিশেষ অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী আইন পাশ হয় এবং ১৯৯৪ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের সঙ্গে সঙ্গাতি রক্ষার জন্য উপরোক্ত আইন সংশোধিত হয়। ৭৩ তম সংশোধনী আইন ছিল ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর দ্বারা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ঃ

চতুর্স্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গা তেমন কার্যকরী হয়নি যার অন্যতম কারণ ছিল ষাটের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, পঞ্চায়েতের উপর অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ, ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ইত্যাদি। পঞ্চায়েতগুলি অচল হয়ে পড়লেও ১৯৬৯ সালের আগে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়নি। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গা পঞ্চায়েতী আইন পাশ হয় যেখানে পূর্বের ন্যায় ত্রিস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার কথা বলা হয়, কিন্তু তদানীন্তন কংগ্রেস রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েতী নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় পূর্বের ত্রিস্তরভিত্তিক ব্যবস্থা অনুসারে (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ)। ১৯২২ সালের যুগান্তকারী ৭৩তম সংশোধনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গা পঞ্চায়েতী আইন সংশোধিত হয়। ১৯৯২ সালের সংশোধনী আইনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে গ্রামসভাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের হাতিয়ার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়ত, প্রতি স্তরের জনসংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণ। তৃতীয়ত, নারীদের জন্য ৩৩.৩৩% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। চতুর্থত, ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বয়ং নির্ভর করে তোলা। পঞ্চমত, প্রতি ৬ মাসে অন্তত একবার গ্রামসভার অধিবেশনকে সংবিধানিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা।

পশ্চিমবঙ্গা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কতটা কার্যকরী হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা আবশ্যক। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, গ্রামের রাস্তা ও বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, শ্মশান ও গোরস্থান সংরক্ষণ, পুকুর ও গৃহপালিত পশুর বিচরণের জন্য মাঠের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। এছাড়াও রাজ্যসরকার নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব গ্রামপঞ্চায়েতকে পালন করতে হয়, যেমন প্রাথমিক স্তরে অবৈতনিক, প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক ও কর্মসংস্থানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চালে ঔষধালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ক্ষুদ্র সেচ ও জল সংরক্ষণ, গৃহহারাগনেণর পুনর্বাসন, ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে সহায়তা, ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ও বিস্তার ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ও মধ্যবর্ত্তী স্তরে অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ। পঞ্চায়েত সমিতির সর্বপ্রধান কাজ হল কৃষি সমবায়, কুটির শিল্প ইত্যাদি বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট এলাকা বা ব্লকের মধ্যে যে কোন জনকল্যাণকারী কর্মোদ্যোগের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ। তৃতীয়ত, গ্রামপঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদকে আর্থিক সাহায্য প্রদান। চতুর্থত, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য আর্থিক সহায়তা। পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে সংহতি সাধন। এছাড়াও গ্রামপঞ্চায়েতের বাজেট অনুমোদন, আর্তত্রাণ ইত্যাদি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারী জেলা পরিষদের প্রধান কাজ হল বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে সংহতি সাধন। জেলা পরিষদ জেলাস্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের বাস্তবায়নের ব্যাপারে রাজ্য

সরকারকে পরামর্শদান করতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট অনুমোদন ও তাদের মধ্যে অর্থবন্টন জেলাপরিষদের দ্বারাই হয়ে থাকে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সংরক্ষণ করা, হাসপাতাল ও ঔষধালয় ও তৎসহ শিশুকল্যাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান, জল নিষ্কাশন, জলসরবরাহ, প্রমোদোদ্যান ও স্থানীয় শিল্প রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যকলাপ জেলাপরিষদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েতের কার্যকলাপ যদি জেলাপরিষদের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে জেলাপরিষদের হস্তক্ষেপ করতে পারবে। জেলাপরিষদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কাজ শেষ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে নির্দেশ দিতে পারে এবং এই নির্দেশ পালিত না হলে শাস্তিস্বরূপ কর আরোপ করার এক্তিয়ারও জেলা পরিষদ ভোগ করে থাকে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জেলা পরিষদ যে কোন গ্রামপঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজের মূল্যায়ন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী রাজ প্রধানত তিনটি নীতিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছে—প্রথমত প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামাঞ্চলে সরকার পরিচালনা বা Governance-এর গণতান্ত্রিকরণ এবং জনগণের শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি ও তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা সঞ্চার। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ কতখানি সার্থক হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাছাড়া নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে যে পঞ্চায়েতীরাজকে কাজ করতে হয়েছে তা অনস্বীকার্য। অর্থাভাব, দলীয় রাজনীতির আধিপত্য, আঞ্চলিক প্রশাসনের রাজনীতিকগন, দুর্নীতি ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধক প্রতিপদে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্য সরকারের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। যেহেতু প্রকৃত অর্থে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমততার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি সেই জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়িত হতে পারেনি এবং পঞ্চায়েতের ভূমিকা গৌণ থেকে গেছে। অর্থের অপ্রতুলতার জন্য পঞ্চায়েত সরকারের অনুদানের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং সেই সঙ্গে আমলাতন্ত্রের চাপ প্রচন্ডভাবে বেড়েছে যা পঞ্চায়েতের স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করেছে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতীরাজের সাফল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। বামফ্রন্ট্রে জামানায় প্রকৃত অর্থে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ ঘটেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তার দ্বারা বহু গ্রাম্য মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকাল সমস্যা সমাধানের পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে বিশেষত অপারেশন বর্গার মাধ্যমে।

আশির দশকে কেন্দ্রীয় সরকার দারিদ্র দূরীকরণের জন্য কয়েকটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ Integrated Rural Development Programme (I.R.D.P), National Rural Employment Programme (N.R.E.P), জওহর রোজগার যোজনা, Rural Landless Employment Gurantee Programme (R.L.E.G.P) প্রমুখের কথা উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি গ্রামাঞ্চলে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও ব্যবস্থার ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, কিন্তু

তৎসত্ত্বেও তার উৎসাহ ও কর্মোদ্যমের কোন অভাব কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। সামগ্রিক বিচারে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানায় পঞ্চায়েতগুলি পূর্বের মত জমিদার ও উচ্চবর্ণের মানুষের আধিপত্যের শিকার হয়নি। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের নিকট প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্যকে খর্ব করতে না পারলে তৃমমূলস্তরে মানুষের ক্ষমতায়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সম্পর্কে সাধারণ মানুষ নিতান্ত নিস্পৃহ। রাজনৈতিক সচেতনাতার অভাব খুবই দুঃখ জনকভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে বহু ক্ষেত্রে গ্রামসভার অধিবেশনে উপস্থিতির হার হয় ন্যূনতম এবং গতানুগতিকভাবে পঞ্চায়েতের কার্যসমাধা করা হয়। আসলে যে কাঠামোর মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে তা প্রকৃতিগতভাবে কেন্দ্রিকৃত এবং এই অন্তর্নিহিত স্ববিরোধির জন্য এখনো পর্যন্ত জনগণের ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেনি।

(ঘ) সর্বভারতীয় স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার চিত্র ঃ

নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে দিয়ে ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অগ্রসর হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে ব্যর্থতা ধারাবাহিকভাবে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে পঞ্চায়েতী রাজ কয়েকটি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

কর্ণাটকে জনগণের ক্ষমতায়নের পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের দ্বারা পঞ্চায়েতের কার্যকলাপ মূল্যায়নের জন্য report card-এর ব্যবস্থা হয়েছে যার দ্বারা জনগণের কাছে পঞ্চায়েকেতর দায়বদ্ধতা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়। কোরালায় Peoples Campaign-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল একদিকে রাজ সরকার থেকে পঞ্চায়েতের কাছে প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর এবং দ্বিতীয়ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ। ১৯৯৬ সালের থেকেই কেরালায় গ্রামসভাগুলিকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করে তোলায় উদ্যোগ নেওয়া হয় বেং প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে আলোচনাসভার আয়োজন ও তার ফলশ্রুতিস্বরূপ উন্নয়নে প্রতিবেদন পেশ করার ব্যবস্থা হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বর্ধিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও এই উদ্যোগ সর্বতোভাবে সফল হয়নি তথাপি অন্ধ্রপ্রদেশে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় উচ্চস্তরের এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ। মধ্যপ্রদেশে তৃণমূল স্তরে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রামস্বরাজ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর করার পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি গ্রামের গ্রামসভা একাধিক কমিটির সাহায্যে কাজ করতে থাকে এবং গ্রাম্য পরিষেবা যাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সেই গ্রামবাসীগণ এই কমিটিগুলির পুরোভাগে ছিলেন। ১৮০০০ পঞ্চায়েত কর্মী হিসাবপত্র রক্ষা করেন। কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে সাম্প্রতিকতম সংবাদ সরবরাহের মাধ্যমে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য প্রতিটি গ্রামে একজন কিষাণবন্ধু ছিলেন। তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা ৫০,০০০-এ গিয়ে দাড়িয়েছিল। এছাড়া মধ্যপ্রদেশে প্রায় ২,৬০,০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ক্রিয়াশীল ছিল এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় ১,২৯,০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী একযোগে ৯৮ কোটি টাকায় Microcredit সৃষ্টি করে ঋণগ্রস্ত মানুষকে রক্ষা করে।

রাজস্থানেও তৃণমূলস্তরে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০০৫ সালে রাজস্থানে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠনের (M.K.S.S.) সদ্যসগণ দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা People's Manifesto বা জনগণের ইস্তেহার নিয়ে জনসাধারণের কাছে গিয়েছেন। এই ইস্তেহার প্রধানত সামাজিক সংস্কারের উপরে জোর দেয় এবং বাল্যবিবাহ, দুর্নীতি, মাদকদ্রব্যের বে-আইনি ব্যবসা ইত্যাদি সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা হয়। M.K.S.S.-এর যে সদস্যবৃন্দ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাঁরা তাঁদের ঘোষণা পত্রের দ্বারা জনগণকে জানান যে কোন পরিস্থিতিতেই নির্বাচনী প্রচারের জন্য তাঁরা ২,০০০ টাকার বেশি ব্যয় করবেন না। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে যদিও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের ৫,০০০ টাকা খরচ করার অধিকার ছিল, কিন্তু কম টাকা খরচ করলে দরিদ্র মানুষের পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানো সহজ হবে। তাঁরা সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে দরিদ্র মানুষ যদি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায়, তাহলে উন্নয়নের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা অসম্ভব। রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

মূল্যায়ন

(ঙ) জনগণের ক্ষম য়-স্বপ্ন ও বাস্তব ঃ

ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের সহায়ক হতে পেরেছে কি না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যদিও পঞ্চায়েতী রাজকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ ও বিকৃতিগুলিকে দূর করার দিকে নজর দেওয়া হয়নি।

বলবন্ত রায় মেহতা কমিটির প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার ভাব বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে কারণ পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রমুখ কয়েকটি রাজ্য ছাড়া পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতায়নের উদ্যোগ অন্য কোন রাজ্যে নেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে বশ্য কেরালা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যদিও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চায়েতী রাজকে উর্ধ্বস্তরের সরকারের ক্রীড়নক হিসাবে চিন্তা করা হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারেনি। কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় 'Today Panchayats are acting as more spending agencies implementing only some centrally sponsored or state sponsored strait jacketed programmes with little autonomy of their own'., তাঁরা আরো বলেছেন, 'They have been brought up in a culture in which spontaneous local initiatives and demands have been viewed with an eye of suspicion by the political and administrative authority. This has created over time a dependency sysndrome which has inhabited even the formation of a local political will for more power and autonomy for local Government'. (ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় শৈল ঘোষ, বুদ্ধদেব ঘোষ, 'Dependency versus Autonomy-Identity Crises of India's Panchyatas'-E.P.W. September 20-06, 2003

pp 398-491 ।) বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিচয়ের সংকট বা identity-crisis দেখা দিয়েছে। উপরোক্ত সমালোচকদের মতে ঔপনিবেশিক মানসিকতাই এর প্রধান কারণ। ব্রিটিশ শাসনের সময় গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি উর্ধ্বস্তরের সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, এবং স্বাধীনতার পরেও মৌলিক স্তরে এর কোন পরিবর্তন হয়নি। ৭৩তম সংশোধনী আইনের পরেও না। এ সম্পর্কে উপরোক্ত সমালোচকেরা বলেছেন 'Thus the panchayats of India suffer from an identity crisis. This crisis of identity results from our colonial mindset of teating the local domain as a dependent domain not fit for self-rule. The clientelist political culture of the country derves its strength from such a midest'. আঞ্চলিক স্তরে যে আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে Block Development Officer এর নেতৃত্বে, তার ভূমিকা প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আসলে রাষ্ট্রকৃত্যক বা Civil Servant-রা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না, তাঁদের দায়বদ্ধতা যাকে উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষের কাছে। ফলে তাঁদের ভূমিকা অনেকাংশে agent-এর পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। এক বিশ্লেষণমুখী প্রবন্ধে বিনোদ ব্যাসালু মন্তব্য করেছেন যে এইভাবে একধরনের hierarchy of agents তৈরি হয়েছে (Vinod Vyasalu, 'Transformation in Govermance since 1990's some Reflections' in E. P. W. June 5-11, 2004, pp 2377-2384)।

জনগণের ক্ষমতায়নের উৎস নিহিত আছে ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তনের মধ্যে। উচ্চতর স্তর থেকে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর (devolution of power) না হয় তাহলে পঞ্চায়েত কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। পঞ্চায়েত তথা তৃণমূল স্তরের মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন যেখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাতন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করার পরিবর্তে আলাতন্ত্রের দায়বদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করবে।

(চ) পৌর প্রশাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কেবল গ্রামাঞ্চলে নয়, নগরাঞ্চলেও হতে পারে। Urban Governance-এর প্রশ্নটি সাম্প্রতিককালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় নতুন সহস্রাব্দে নগরায়নের ব্যাপক প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। একই সঙ্গে নগর প্রশাসন ও আঞ্চলিক প্রশাসনের সম্পর্কের বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মোহিত ভট্টাচার্য Report of the Second Municipal Finance Commission-এ বলেছেন 'being closest to the local community a municipality is eminenty suited to respond to diverse local needs in the most economical manner as the public at the local level, car easily perceive the linkage between taxation and local public expenditure. নগরের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পথকে প্রশস্ত করা।

এ প্রসঙ্গে ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই আইনের দ্বারা স্বাধীনতা উত্তরকালে সর্বপ্রথম পৌরপ্রশাসনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। নগরকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তিন প্রকার প্রতিষ্ঠানের কথা এই আইনে বলা হয়েছিল।

১। নগর পঞ্চায়েত যা নগরায়নের পথে অগ্রসর কোন গ্রাম এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২। ক্ষুদ্র নগর এলাকার জন্য পৌর পরিষদ বা Municipal Council.

৩। বৃহৎ নগরাঞ্চলের জন্য পৌরসভা বা Municipal Corporation.

এই আইন অনুযায়ী যে কোন পুরসভার অন্তর্গত এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ৩ লক্ষের বেশি সেখানে Ward Committee গড়ে তোলার নির্দেশ জারি হয়। এছাড়া প্রত্যেক পৌরপ্রতিষ্ঠানে নারী ও সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর অংশের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়। নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের কথা এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়। তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল। Municipality গুলির জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যি কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগে Municipality ভেঙে যায় তাহলে ছ মাসের মধ্যে পৌর নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন ভারতে সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাস প্রকৃত অর্থে এক যুগান্তকারী ঘটনা যার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী নগরকেন্দ্রিক প্রশাসনের এক সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে West Bengal Municipal Act বলবৎ হয়. এর দ্বারা ১৯৩২ সালের Bengal Municipal Act এর পরিবর্তে Chairman in Council এর প্রবর্তন হয়। অবশ্য শাসককুলের মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশেষ সুফল লাভ করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ম হয়ে প্রতীয়মান হয় এবং কেন্দ্রের তরফ থেকে ক্ষমতার উদ্যোগ না এলে রাজ্য সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা সহজসাধ্য হবে না। তবে ৭৪তম সংশোধনী আইন নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ যার দ্বারা শাসনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

সারাংশ

ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণেরক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তৃণমূলস্তরে জনগণের ক্ষমতায়নের দ্বারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েতী রাজের প্রবর্তন হয়। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য পরিল ক্ষত হয়েছে তবে এখন নানাবিধ প্রতিবন্ধক রয়েছে যেগুলি অপসারণ না করে প্রকৃত পথে এগোনো যাবে না। উক্ত প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পৌর প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিও অবতারণা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন কোন সালে পাশ হয়?

(খ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী আইন কোন সালে পাশ হয় ?

(গ) কোন সংবিধান সংশোধনী আইন পৌরপ্রশাসনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে ?

২। **নীচের প্রশ্নগুলির রচনাধর্মী উত্তর দিন ঃ**

(ক) বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি কী ছিল ?

(খ) পঞ্চায়েতীরাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) জেলা পরিষদের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। **২৫০ শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ**

(ক) ভারতে পঞ্চায়েতীরাজের মধ্যে দিয়ে তৃণমূলস্তরে জনগণের ক্ষমতায়ন কতখানি সম্ভব হয়েছে ?

(খ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতীরাজ কতখানি সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

(গ) পঞ্চায়েতীরাজের সাফল্যের পথের প্রধান প্রতিবন্ধকগুলি কী ?

গ্রন্থপঞ্জী

(1) অসিত বসু, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩।

(2) Mohit Bhattacharya and Prabhat Dutta, Governing Rural India, Uppal Publishing House, New Delhi, 1991.

(3) Shriradm Maheswari, Local Goverment in India, Orient Longman, New Delhi, 1971.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY